দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

রাখিবন্ধন :

নারী শক্তি উদ্‌যাপন

— পৃঃ ২১

স্বদেশী অর্থনীতি :

শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর ভারতের রোডম্যাপ

— পৃঃ ১৫

৭৮ বর্ষ, ৫২ সংখ্যা।। ২৪ আগস্ট, ২০২৬।। ৬ ভাদ্র, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

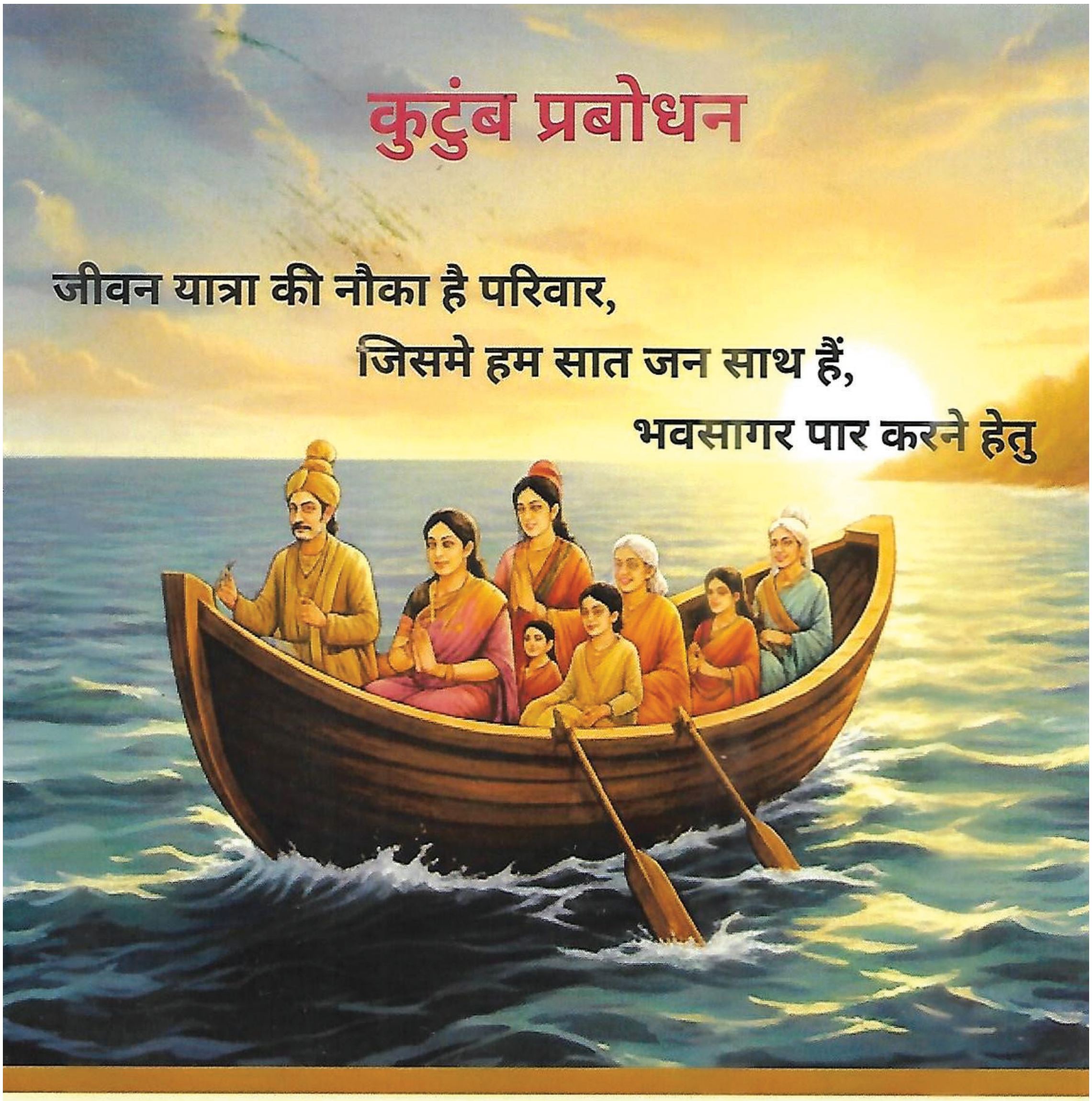

लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৫২ সংখ্যা, ৬ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

২৪ আগস্ট - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

পাঁচ দশকের অভিশাপ মুছতে বহু ধরনের রাজনৈতিক ভাষা প্রয়োজন ঃ ‘কোন সে কঠিন আসবে বলে’ ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

চটিজীবী কম পড়িয়াছে ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

আন্তর্জাতিক কূটনীতির শীর্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঃ বিশ্বমঞ্চে ভারতের জয়গান ◻ প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য ◻ ৮

স্পেনে মরক্কোর আক্রমণ, ভারতকে সাবধান থাকতে হবে ◻ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ◻ ১১

আনন্দমঠ ও বন্দে মাতরম্-এর আলোকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রভাবনা ◻ সঙ্ঘমিত্রা সরকার কবিরাজ ◻ ১৩

স্বদেশী অর্থনীতি : শক্তিশালী ভারতের রোডম্যাপ ◻ ডঃ সুতনু সামন্ত ◻ ১৫

চলমান জনগণনা এবং সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে সচেতনতা ◻ ডঃ শ্যামলচন্দ্র দাস ◻ ১৭

‘রাখি’র গল্পগুচ্ছ ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

রাখিবন্ধন : জাতীয় চেতনা ও সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবোধের এক চিরন্তন উৎসব ◻ কিশোর বর্মণ ◻ ৩৪

লৌহকপাটের আড়ালে ষোলো মাস ◻ বিজয় আঢ্য ◻ ৩৬

মুর্শিদাবাদ জেলার নামকরণ করা হোক কর্ণসুবর্ণ ◻ জীতেন্দ্রনাথ ঘোষ ◻ ৩৮

আরশোলার ব্যাকরণ ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ ◻ অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৪৩

জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে গণতন্ত্র রক্ষায় কারাবরণ করেছিলেন লোকতন্ত্র সেনানীরা ◻ ডাঃ সনৎ বসু মল্লিক ◻ ৪৭

গল্পকথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

প্রকাশিত হবে
৩১ আগস্ট
২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৩১ আগস্ট
২০২৬

FCRA সংশোধনী বিলে আপত্তি কেন?

কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন এনজিও এবং অন্যান্য সংস্থায় আসা বিদেশি অনুদান কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য FCRA সংশোধনী বিল এনেছে। সরকার পরিষ্কার জানিয়েছে, নিয়ম মেনে বিদেশি ফান্ড খরচ করতে হবে। কিন্তু কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিপক্ষ দল এর বিরোধিতা করায় বিলটি আপাতত সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়েছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিলের বিষয়ে আলোচনা করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে উনআশি বর্ষ পূর্ণ করতে চলেছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সম্প্রীতির মহান উৎসব

সমরসতার পীঠস্থান ভারতভূমি। বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋক্‌বেদে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে — 'সং বদধ্বম্ সং গচ্ছধ্বম্ সং বো মনাংসি জানতাম্' মন্ত্র। প্রাচীন ভারতে মানুষে মানুষে কোনোপ্রকার ভেদাভেদ ছিল না। গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে সমাজ পরিচালিত হইত। জাতিভেদ ব্যবস্থার নামমাত্র ছিল না। হিন্দুধর্মে ঈশ্বর অথবা অবতার পুরুষগণ সমস্ত রকম ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে ছিলেন। তাঁহারা আপামর মানুষের প্রতি কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি কাহারও প্রতি দ্বেষ অথবা পক্ষপাতিত্ব করেন না। যে তাঁহাকে ভক্তিভাবে ভজনা করিয়া থাকেন, তিনি তাহাকেই কৃপা প্রদান করিয়া থাকেন। হিন্দু সমাজের এই যে ঔদার্য তাহার অনুশীলনের পরম্পরাকে ধারাবাহিকতা প্রদান করিয়াছেন ভারতীয় ঋষিগণ। সমাজে ন্যায়, নীতি, সমতার ভাবটি চিরন্তন রাখিবার উৎসবটি হইল রক্ষাবন্ধন। পঞ্জাব ও বঙ্গভূমিতে ইহা 'রাখিবন্ধন' নামে পরিচিত। ইহা উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে শ্রাবণীপূর্ণিমা তিথিতে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই রাখিবন্ধন এক মহান সম্প্রীতির উৎসব হিসাবে স্মরণাতীত কাল হইতে মানব সমাজকে প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়াছে। ইহার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বিদ্যারম্ভ উপলক্ষ্যে গুরুগৃহে শিষ্যের আগমনে। নবাগত শিষ্যের হস্তে রক্ষাসূত্র বন্ধন করিয়া গুরু তাহাকে সর্বপ্রকারে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। রামায়ণের বিভিন্ন লোককথা অনুযায়ী, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অত্যাচারী রাবণের বিরুদ্ধে জয়লাভের নিমিত্ত বানর সেনাপতিদিগের হস্তে পুষ্পলতা দ্বারা রক্ষাসূত্র বন্ধন করিয়াছিলেন। মহাভারতে শিশুপাল বধের সময়ে দ্রৌপদী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গুলিতে বস্ত্রখণ্ড বন্ধনের কাহিনি সকলের জ্ঞাত বিষয়। ইহা ব্যতীত, লক্ষ্মীদেবীর বলি রাজাকে রাখিবন্ধন, ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর রাখিবন্ধন, যম-যমুনার রাখিবন্ধন, সিদ্ধিদাতা গণেশের ভগিনী কর্তৃক স্বীয় ভ্রাতা গণেশকে রাখিবন্ধনের ঘটনাগুলি উল্লেখযোগ্য। ষষ্ঠীপূজা ও মা সন্তোষী ব্রত উদ্‌যাপনের পর স্বামী, পুত্র-কন্যা ও পরিজনদিগের হস্তে যে রক্ষাসূত্র বন্ধন তাহাও রাখিবন্ধন। ঐতিহাসিক কিংবদন্তী অনুসারে, আলেকজান্ডারের স্ত্রী কর্তৃক পৌরবরাজ পুরুর হস্তে রাখিবন্ধন, চিতোরের রানি কর্ণাবতীর মোগল বাদশাহ হুমায়ুনকে 'রাখিভাই' সম্বোধন করিয়া রাখি প্রেরণ ইত্যাদি রাখিবন্ধনের মহান সম্প্রীতির দিকই নির্দেশ করিয়া থাকে। প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ক্ষণের প্রয়োজন যে পড়ে না তাহা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন সংঘটিত করিয়া ১৬ অক্টোবরে 'অকাল রাখিবন্ধন' পালন করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা প্রমাণ করিয়ছিলেন। এই মহান উৎসবটি শুধুমাত্র মানুষের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া ভারতের জনজাতি সমাজের মানুষেরা অরণ্য রক্ষার্থে বৃক্ষরাজিকেও রাখিবন্ধন করিয়া থাকেন।

কালের কুটিল চক্রে এক সময় সম্প্রীতির পীঠস্থান এই ভারতভূমিতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ প্রকট হইয়া ওঠে। তাহারই সুযোগ লইয়া বৈদেশিক শক্তি ভারতবর্ষকে সহস্র বৎসর পরাধীন রাখিয়াছিল। সেই আবহে রাখিবন্ধনের ন্যায় এক হৃদয়স্পর্শী উৎসব শুধুমাত্র ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুজাতির সৌভাগ্য যে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংস্থাপক ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার রাখিবন্ধনকে সঙ্ঘের উৎসবের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহার সীমোল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। সঙ্ঘের শতবর্ষের যাত্রায় স্বয়ংসেবকগণ রাখিবন্ধন উৎসবকে ভারতীয় সমাজজীবনে পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন। স্বয়ংসেবকগণ রাখিপূর্ণিমার দিন হইতে সপ্তাহব্যাপী দেশের সর্বত্র— গ্রামবাসী-নগরবাসী,গিরিবাসী-অরণ্যবাসী, জনজাতি-উপজাতি সকলের মধ্যে রাখির মাধ্যমে সম্প্রীতির আবহ নির্মাণ করিয়া থাকেন। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির ভগিনীগণ সীমান্তে প্রহরারত সৈনিকদিগের হস্তে রক্ষাসূত্র বন্ধন করিয়া তাহাদিগের মনোবল বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। বিদ্যাভারতী পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির আচার্য-আচার্যা, ছাত্র-ছাত্রীগণ অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আপামর মানুষের হাতে রাখিবন্ধন করিয়া সম্প্রীতি ও রাষ্ট্রচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন। এই কথা সকলেই নির্দ্বিধায় স্বীকার করিবেন যে, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদিগের উদ্যোগেই রাখিবন্ধন উৎসব আজ পরিবারের সীমানা অতিক্রম করায় দেশব্যাপী সম্প্রীতি ও রাষ্ট্রচেতনার আবহ রচিত হইয়াছে। আনন্দের বিষয় যে, রাজ্যের সর্বত্র সরকারি উদ্যোগে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। তিনি নিঃসন্দেহ ধন্যবাদার্হ।

সুভাষিতম্

আত্মজ্ঞানং সমারম্ভঃ তিতিক্ষা ধর্মনিত্যতা।।
যমার্থান্নাপিকর্ষন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্চতে।।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি নিজের যোগ্যতাকে ভালোভাবে জানেন, সেই অনুসারে লোককল্যাণকারী কাজে তৎপর থাকেন; তাঁর মধ্যে দুঃখ সহ্য করার শক্তি রাখেন এবং যিনি বিপরীত পরিস্থিতিতেও ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হন না, তাঁকেই প্রকৃত জ্ঞানী বলা হয়।

পাঁচ দশকের অভিশাপ মুছতে বহু ধরনের রাজনৈতিক ভাষা প্রয়োজন

‘কোন সে কঠিন আসবে বলে’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

১৯৪৯ ও ১৯৬১-তে ঐতিহাসিক মার্ক ব্লোচ এবং ই এইচ কার তাঁদের বিখ্যাত দুই গ্রন্থ ‘দ্য হিসটোরিয়ান’স ক্র্যাফট’ এবং ‘হোয়াট ইজ হিস্ট্রি?’— ইতিহাস কাকে বলে?’-তে একবাক্যে দাবি করেছিলেন একমুখী ইতিহাস বলে কিছু নেই। ইতিহাস সেটাই যা দিয়ে তা তৈরি হয়। তাতে কেবল তথ্য নেই। আছে সময়, সমালোচনা, বিশ্লেষণ এবং পাশাপাশি গড়ে ওঠা কার্যকারণ। আগে থেকে কোনো সিদ্ধান্তে এসে ইতিহাস লেখা যায় না। আর ইতিহাসের কাছে ব্যক্তি ও সমাজ আলাদা দু’টি সত্তা। দু’টোকে মিলিয়ে ফেললে তাতে ইতিহাসের অপলাপ হয়।

রাজ্যে সমানে জঙ্গি ধরা পড়ছে। তার একটা ইতিহাস রয়েছে। কোচবিহার থেকে আসানসোল হয়ে কলকাতা। তিন মাসের বিজেপি সরকারের কালে তারা ঢুকেছিল তেমনটা ভাবা পাগলামি। মুসলমান তোষণবাদী পুরনো সরকারের আমলে এটা তাদের সেফ করিডোর ছিল। আর তার কারণে এই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে সততার প্রতীক সাজিয়ে স্রেফ ভোটের খাতিরে সমাজ ও রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করেছিল তার দলবল। ক্ষমতার নেশায় তিনি তা মেনে নিয়েছিলেন। ক্ষমতালিপ্সা এত প্রবল যে গোহারা হেরে যাওয়ার দু’মাস পরে তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন। সকলে মিলে রাজনৈতিক ভাষার বহু মৌরসি তৈরি করে তার পাট্টা বানিয়েছিল।

প্রাক্তন সরকার লুম্পেন রাজ তৈরি করেছিল। তার অন্যতম প্রধান হলো ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতা। মাওবাদীর মন জয় করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর ভাষায় তাঁরা দিমাগি মাও। এই দিমাগ যদি বুদ্ধি-চেতনার পরাকাষ্ঠা হয় স্বয়ং ঈশ্বর এ দেশকে বাঁচাতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রীর এই উদার মানসিকতা ভুল দিমাগিদের জন্য নয়। তারা দিমাগি হোক বা অস্ত্রধারী, তাদের জন্য একটাই উত্তর। লাঠৌষধি। কিছু রবিনহুডকে নিয়ে দেশ চলে না।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উলটো হেঁটে ঠিক করছেন। নকশাল বা খ্যাকশিয়াল যা হোক গুন্ডাদমন আইন ব্যবহার করে তাদের শায়েস্তা করা হচ্ছে। নকশালরা কোনো সুস্থ রাজনৈতিক গোষ্ঠী নয়। তারা নিজেরাই তা প্রমাণ করেছে। তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। তবে ওই মড়াতে খাঁড়া মারতে হবে। অভয়া কাণ্ডের অন্যতম দুষ্কৃতী পানিহাটির নির্মল ঘোষ (নান্টু)-সহ পুরোনো এক বামপন্থী কাউন্সিলরের জেল হয়েছে। আরও কঠিন সময় এগিয়ে আসছে। কালীঘাটের বন্ধ তালা ভাঙতে হয়তো আর বেশি সময় লাগবে না। রাজনৈতিক পরিবর্তন না ঘটলে এই সত্যগুলো কোনোদিন প্রকাশ পেত না।

রাজনৈতিক ভাষার উলটো পাঠ এ রাজ্যের মানুষ শোনেনি। নতুন সরকার তা শোনাবে। গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে তা করতে হবে। কালীঘাটের নেত্রীর বন্ধ ট্রাঙ্কে তা চাপা পড়ে আছে। পুরনো শাসক দলের যেকোনো সদস্য চোর-বাটপার -খুনি-ডাকাত বা সমাজবিরোধী হতে পারে। তবে বীরভূমের এক পরাজিত নেতা ব্যতিক্রম (আশিস ব্যানার্জি) বলে কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দলটির দুর্নীতির পরিমাপ ধরা পড়েছে। তিনি আত্মহনন করেছেন। নারকীয় বগটুই কাণ্ডে তাঁর নাম জড়িয়েছিল।

নতুন রাজ্য সরকারের যে ৩২ ধরনের ভালো কাজের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। বাস্তবে তা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন থাকতেই পারে। পঞ্চ পরিবর্তনের পর প্রধানমন্ত্রীর ৭-দফা সংস্কার কর্মসূচির যে দাবি স্বাধীনতা দিবসে প্রচার হয়েছে তার বাস্তবতা কিছু বাতুল বক্তব্যে হারিয়ে যেতে বসেছে। যেকোনো জনপ্রতিনিধির চরিত্রবান হওয়া যেমন কাম্য, তেমনই কাম্য কে বা কারা চরিত্রহীন তার সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবনা তৈরি করা। সে সাংসদ হোক বা রাজনৈতিক নেতা।

এই মুহূর্তে তেলাপোকার দল ঝাড়খণ্ড নিয়ে সমস্যায় রয়েছে। ফলে এখানকার কিছু আগমার্কা ছাত্র খেপানো নেতা শীতগর্তে প্রবেশ করেছে। ভারতের মতো এ রাজ্যের ক্ষেত্রেও কোনো বুদ্ধিমান বিরোধী নেতা নেই। ফলে কেন্দ্রে ও রাজ্যে বিজেপি সরকারের ভুল-ত্রুটি ধরতে পারে এরকম কোনো রাজনৈতিক দল নেই। কিছুদিন আগেই নেতাজী আর ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে ঐতিহাসিক চর্চা শুরু হয়েছিল। সামনে অনেক বড়ো কাজ রয়েছে। অভিন্ন দেওয়ানি তার অন্যতম। তাই আজেবাজে আলোচনা আর বিশ্লেষণ সরিয়ে রেখে আগামী ৫ বছরের কঠিন সময় পেরোতে হবে। সামনে কলকাতা ও হাওড়া পুরসভা আর ১২৪টি পৌরনিগমের ভোট। তাতে সাড়া দিতে হবে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

চটিজীবী কম পড়িয়াছে

অভাগীষু দিদি,

ওঁরা কোথায় গেলেন বলুন তো! দলের ভাইয়েরা তো চলে গেছে যে যার মতো স্বার্থের খোঁজে। কিন্তু সেইসব দাদা-দিদি, ভাই বোনেরা কোথায়! যাঁরা ক্ষমতায় থাকা আপনাকে খালি তেল দিয়ে গেছেন, নিজেদের আখের গুছিয়ে গেছেন, তাঁরা আজ কোথায়! যা অবস্থা তাতে নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা শোনাতে হবে, ফিরে এসো সবাই। তোমাদের কেউ বকবে না। পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের চটিজীবী করেছিলেন আপনি। আমার কথাও শোনেনি। এখন তাঁরা কোথায় দিদি!

২০০৯ সালে আপনি যখন রেলমন্ত্রী হলেন তার কয়েক মাসের মধ্যেই তৈরি হয় কিছু বিশেষজ্ঞ কমিটি। জায়গা পেলেন শিল্প-সংস্কৃতি জগতের বড়ো বড়ো সব নাম। তালিকা দীর্ঘ— থিয়েটারের শাঁওলি মিত্র, বিভাস চক্রবর্তী, ব্রাত্য বসু, অর্পিতা ঘোষ, সাহিত্যিক জয় গোস্বামী, চিত্রশিল্পী যোগেন চৌধুরী, শুভাপ্রসন্ন, সমীর আইচ, গায়ক দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, পল্লব কীর্তনীয়া, চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ ও হরনাথ চক্রবর্তী, অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবী, নৃত্যশিল্পী অমলাশঙ্কর। আরও কত...

দু'বছর পরে রাজ্যের ক্ষমতায় এসে আর কমিটিতেই থেমে থাকলেন না। নতুন আকাদেমিও বানালেন। বাম আমল থেকেই রাজ্যে ছিল বাংলা আকাদেমি, নাট্য আকাদেমি, সঙ্গীত আকাদেমি, বিদ্যাসাগর আকাদেমি, দলিত সাহিত্য আকাদেমি। নানা দায়িত্বে অনেকে। এত লোককে জায়গা দিতে হবে তো! সরাসরি সরকারি পদে। সেই সব লেখক-শিল্পীর সান্নিধ্যে এসে আপনার বহুমুখী সৃষ্টিশীল প্রতিভার প্রকাশ্য প্রকাশ বাড়তে লাগল।

আপনি কখনো শিল্প-সংস্কৃতি জগতের কারও অসুস্থতা, আর্থিক অনটন বা অন্য কোনো গুরুতর বিপদের কথা জানতে পারলেই নিজে উদ্যোগী হয়ে সরকারি তরফে সাহায্যের ব্যবস্থা করতেন। কবি জয় গোস্বামী তো আপনার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করেছেন। এর পরে আপনার ভাষায় শুরু হলো ডেড বডি রাজনীতি। বিখ্যাতদের মৃত্যুর পরে শেষযাত্রার দখল কার্যত নিয়ে নেন আপনি। খালি মান্নাদের দেহ পাননি।

বাম আমলে রবীন্দ্রসদনে দেহ রাখা, পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং শোকবার্তা প্রকাশের মাধ্যমেই সরকারি স্তরের সর্বোচ্চ সম্মান জানানো হতো। আপনি শুরু করেন পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়, গান স্যালুট-সহ শেষ বিদায়। মহাশ্বেতা, সৌমিত্রদের ক্ষেত্রে সেটাই হয়।

ধীরে ধীরে আপনি একটা চাটুকার শ্রেণী তৈরি করে ফেলেন। কেউ কেউ আপনাকে সরাসরি সমর্থন না করলেও বিজেপির নিন্দা করে পরোক্ষে তৃণমূলের হয়েই কাজ করেছেন। এঁদের সবাই চটিচাটা বললেও কলাটা, মুলোটার জন্য অনেকে রাগেননি। সরে যাননি। ওই যে, আপনার বিখ্যাত বাণী— যে গোরু দুধ দেয় তার লাথিও খাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আপনি ছিলেন দুধেল গাই। যত দিন দুধ মিলেছে সবাই ছিল। এখন দুধ ক্ষীর নেই। কেউ নেই।

বাম আমলে তসলিমা নাসরিন কলকাতা- ছাড়া হওয়ার প্রতিবাদে প্রতুল গান বাঁধলেন, 'হায় হায় হায়, ক্যা শরম কী বাত, মার্কসবাদী পার্টি ভি নাচে মৌলবাদকে সাথ।' কিন্তু তৃণমূল আমলে যখন তসলিমার বই প্রকাশ বা তাঁর লেখা সিরিয়ালের সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেল, প্রতুল আর নতুন গান বাঁধলেন না। বরং, রোগশয্যাতেও গান শোনালেন 'আমি বাংলায় গান গাই'।

আপনি এটা শুরু করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে কাছে টেনে। সেটা বিরোধী আসনে থাকার সময়ে। আর পরে যোগেন চৌধুরীর মতো শিল্পীকেও তল্পিবাহক বানিয়ে ফেললেন। নির্বাচনী হিংসা বা গণহারে চাকরি চুরি, সবেতেই চুপ রইলেন আপনি। বাম আমলে তসলিমা নাসরিন কলকাতা- ছাড়া হওয়ার প্রতিবাদে প্রতুল গান বাঁধলেন, 'হায় হায় হায়, ক্যা শরম কী বাত, মার্কসবাদী পার্টি ভি নাচে মৌলবাদকে সাথ।' কিন্তু তৃণমূল আমলে যখন তসলিমার বই প্রকাশ বা তাঁর লেখা সিরিয়ালের সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেল, প্রতুল আর নতুন গান বাঁধলেন না। বরং, রোগশয্যাতেও গান শোনালেন 'আমি বাংলায় গান গাই'। যেটা রাজনৈতিক ভাবে ভাইরাল হয়ে গেল। চিটফান্ড নিয়ে 'যা গেছে তা যাক' গান বেঁধেছিলেন সুমন। তারও আগে রামজন্মভূমি আন্দোলনের সময়ে সেই গান, 'হাল ছেড়োনা বন্ধু'। পরবর্তীকালে আপনার উপরে গোঁসা করে 'খাও, খাও, খাও' বাণী। কিন্তু পরে সব থেমে গেল। ২৬ হাজার চাকরি বিক্রির সংস্কৃতির বিরুদ্ধেও চুপ।

জয় গোস্বামীর কথা আর বলছি না। তিনি তো শুধু আপনি নন, ভাইপোকেও তেল দিয়েছেন অকাতরে। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগেও। তাঁর তেল পেয়ে ধন্য হয়েছেন তৃণমূলের মহুয়া মৈত্রও। কিন্তু এখন, কে কোথায়!

এখন মনে হয় আপনিও ঘরে বসে ওঁদের কথা ভাবেন। ভাবুন। ভাবতে থাকুন। ইতিহাস সাক্ষী থাকবে কেউ আপনাকে আর পোছে না আমি ছাড়া। এখনো নিয়মিত সাপ্তাহিক চিঠিটা লিখে চলেছি। □

আন্তর্জাতিক কূটনীতির শীর্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

বিশ্বমঞ্চে ভারতের জয়গান

প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বরাজনীতিতে দ্রুত বদলাচ্ছে ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ। এই পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যে অসাধারণ রাষ্ট্রনেতা নিজের দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও অসাধারণ কূটনৈতিক দক্ষতার মাধ্যমে বিশ্বমাঝে ভারতকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন, তিনি হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০১৪ সালে ভারতীয় শাসন ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে চলে আসেন তিনি। দেশের শাসনভার কাঁধে তুলে নেওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি বিশ্বমঞ্চে ভারতের কণ্ঠস্বরকে শুধুমাত্র জোরালোই করেননি, বরং 'গ্লোবাল সাউথ' কিংবা উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রধান নেতৃত্ব হিসেবে ভারতকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কূটনৈতিক সাফল্যের এক অসামান্য নজির গড়ে মোদীজী বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সব মিলিয়ে তিন ডজনেরও বেশি সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও জাতীয় সম্মাননা লাভ করেছেন। এই সব পুরস্কার নিছকই এক রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন নয়, বরং এটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভারতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব, অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রভাবের এক প্রামাণ্য দলিল। এবার দেখে নেওয়া যাক এক যুগ ধরে প্রধানমন্ত্রীর ঝুলিতে এসেছে কোন কোন আন্তর্জাতিক পুরস্কার-সম্মাননা এবং বিশ্বরাজনীতিতে সেগুলির গুরুত্বই-বা কী।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার মোদীজীর অন্যতম বড়ো কূটনৈতিক সাফল্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক বৈরী ভাবাবেগ দূর করে এক মজবুত কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা। বহু দশক ধরে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও কাশ্মীর ইস্যুতে মধ্যপ্রাচ্যের যে

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মোদীজীকে একজন দৃঢ়চেতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম নেতা হিসেবে দেখা হয়।

দেশগুলি পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে ছিল, আজ তারাই ভারতকে তাদের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক ও কৌশলগত মিত্র হিসেবে গণ্য করে। এর প্রমাণ মেলে এই দেশগুলির দেওয়া সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা থেকে।

প্রথমেই তাকানো যাক সৌদি আরবের দিকে। এই ইসলামি দেশটি ২০১৬ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীজীকে তাদের দেশের অ-মুসলিম বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মাননা প্রদান করে। এই সম্মাননার পোশাকি নাম— 'অর্ডার অফ কিং আবদুল আজিজ'। একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশের হিন্দু রাষ্ট্রপ্রধানকে একটি ইসলামিক দেশের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করা তাৎপর্যপূর্ণ বই কী! প্রধানমন্ত্রীর এই সফর দুই দেশের মধ্যে সূচনা করে জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাসবাদ দমনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের।

এর ঠিক তিন বছর পরে, ২০১৯ সালে সেই মোদীজীকেই সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার দেয় সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এই ইসলামি দেশটিও 'অর্ডার অফ জায়েদ' দিয়ে সম্মানিত করে। মোদীজীই প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি এই দুর্লভ সম্মান লাভ করেন।

ভারতের ভারসাম্যপূর্ণ সনাতনী কূটনীতির এক ঐতিহাসিক নজির হিসেবে মোদীজীকে তাদের দেশের সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান দেয় প্যালেস্তাইন। ২০১৮ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তারা দেয় 'গ্র্যান্ড কলার অফ দ্য স্টেট অফ ফিলিস্তিন' পুরস্কার।

পারস্য উপসাগরীয় দেশ বাহরিনও মোদীজীকে দিয়েছে তাদের সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান। পুরস্কারের নাম 'কিং হামাদ অর্ডার অফ দ্য রেনেসাঁ'। ২০১৯ সালেই মোদীজীর ঝুলিতে চলে এসেছিল এই সম্মাননা।

২০২৫ সালে মোদীজীকে সম্মাননা দেয় ওমান। পুরস্কারের নাম 'অর্ডার অফ ওমান'। আরব সাগরের তীরে অবস্থিত ভারতের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত প্রতিবেশী দেশ ওমান তাদের সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মানে ভূষিত করে মোদীজীকে।

বৃহৎ আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির সঙ্গে সমান তালে পা মিলিয়ে ভারতের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের কূটনীতি উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য দিকে রাশিয়ার মতো প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের কাছ থেকে একই সঙ্গে সর্বোচ্চ সম্মান পাওয়া ভারতের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিদেশনীতির এক বিরাট জয়।

২০২৪ সালে মোদীজীকে 'অর্ডার অফ সেন্ট অ্যান্ড্রু' পুরস্কারে ভূষিত করে রাশিয়া। এটি রাশিয়ার সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা এবং বিশ্বশান্তিতে অবদানের জন্যই রাশিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ভূষিত করে এই বিরল সম্মানে।

মোদীজীকে পুরস্কার দিয়েছে আমেরিকাও। ২০২০ সালে তাঁকে দেওয়া হয় 'লিজিয়ঁ অফ মেরিট' পুরস্কার। মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এই সামরিক ও অসামরিক পদকটি তুলে দেওয়া হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর হাতে। ভারত ও আমেরিকার কৌশলগত অংশীদারিত্বকে 'কোয়াড' জোটের মাধ্যমে নতুন রূপ দেওয়ার স্বীকৃতি স্বরূপ মোদীজীকে দেওয়া হয় এই পুরস্কার।

২০২৩ সালে মোদীজীকে পুরস্কার দিয়েছে ফ্রান্সও। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ভূষিত করা হয়েছে 'গ্র্যান্ড ক্রস অফ দ্য লিজিয়ঁ অফ অনার' সম্মানে। প্যারিসের দেওয়া এই সম্মাননাটি ফ্রান্সের সর্বোচ্চ অসামরিক এবং সামরিক পুরস্কার। ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রী এর আগে এই সম্মান পাননি।

মোদীজীর ঝুলিতে রয়েছে 'গ্র্যান্ড ক্রস অফ দ্য অর্ডার অফ অনার'-ও। ২০২৩ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এই পুরস্কার দেয় গ্রিস। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য দেশ গ্রিস তাদের দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা দিয়ে ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রশংসা করে। মোদীজীকে পুরস্কৃত করেছে সাইপ্রাস ও সুইডেন। ভূমধ্যসাগরীয় দেশ সাইপ্রাস মোদীজীকে 'গ্র্যান্ড ক্রস অফ দ্য অর্ডার অফ মাকারিওস থার্ড' এবং উত্তর ইউরোপের প্রভাবশালী দেশ সুইডেন তাদের বিখ্যাত 'অর্ডার অফ দ্য পোলার স্টার' সম্মানে ভূষিত করে প্রমাণ করেছে মোদীজীর বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রী মোদীজী বলেছেন যে, তাঁর প্রাপ্ত এই সম্মান হলো ভারতের সম্মান। তাঁকে পুরস্কৃত করার মাধ্যমে দেশগুলি 'ভারত'-সহ ১৪০ কোটি ভারতবাসীকে তাদের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছে। দেশবাসীর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি এই সম্মান গ্রহণ করছেন।

ভারতের বিদেশনীতির অন্যতম মূল ভিত্তি হলো 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতি। দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী মনোভাবকে প্রতিহত করতে ভারতের এই অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

আজকের ভারতকে বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতি বা অর্থনীতির কোনো সমীকরণই মেলানো সম্ভব নয়। মোদীজীর কূটনৈতিক দূরদর্শিতা ভারতকে কেবল বিশ্বমঞ্চে মর্যাদাপূর্ণ আসনেই বসায়নি, বরং আগামীদিনে ভারতকে এক প্রকৃত 'বিশ্ববন্ধু' বা বিশ্বমঞ্চের অভিভাবক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পথ মসৃণ করেছে।

বরাবর ভারতের পরম মিত্র দেশ ভুটানও সে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা দিয়েছে মোদীজীকে। করোনা অতিমারীর সময় ভারতকে পাশে পাওয়ার জন্য তারা কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে।

মোদীজীকে পুরস্কৃত করেছে মালদ্বীপও। ২০১৯ সালে মোদীজীকে 'অর্ডার অফ দ্য ডিস্টিংগুইশড রুল অফ ইজ্জুদিন' নামের সর্বোচ্চ পুরস্কার দেয় ছবির মতো সাজানো এই দ্বীপদেশ। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশের মতে, ভারত মহাসাগরের কৌশলগত দ্বীপদেশ মালদ্বীপ তাদের সর্বোচ্চ সম্মাননাটি দেয় মোদীজীকে। এই পুরস্কার দুই দেশের নিবিড় নৌ-নিরাপত্তা সম্পর্কের পরিচয় বহন করে বই কী।

মোদীজীর ঝুলিতে রয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের পুরস্কারও। ২০১৬ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া হয় 'স্টেট অর্ডার অফ গাজি আমির আমানুল্লাহ খান' সম্মাননা। আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে ভারতের নিঃস্বার্থ সাহায্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মোদীজীর হাতে তুলে দেওয়া হয় সে দেশের এই সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মানটি।

মোদীজীকে 'মিত্র বিভূষণ' পুরস্কার দিয়েছে আর এক দ্বীপদেশ শ্রীলঙ্কা। অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় ভারতের বাড়িয়ে দেওয়া মানবিক ও আর্থিক সহযোগিতার জন্য ২০২৫ সালে মোদীকে এই শীর্ষ সম্মানে ভূষিত করে লঙ্কেশ্বরের দেশ।

আধুনিক বিশ্বে ভারতের কূটনৈতিক পরিধি কেবল এশিয়া বা ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, ভারতের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে ল্যাটিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলের দেশগুলিতেও। ২০২৫ সালে ব্রাজিল মোদীজীকে দিয়েছে 'গ্র্যান্ড কলার অফ দ্য ন্যাশনাল অর্ডার অফ দ্য সাউদার্ন ক্রস' পুরস্কার। ব্রিকসের অন্যতম শরিক দেশ ব্রাজিল তাদের দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা দিয়ে কুর্নিশ জানিয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের নেতৃত্বদানের ভূমিকাকে। মোদীজীর ঝুলিতে এসেছে

মিশরের সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কারও, নাম 'অর্ডার অফ দ্য নাইল'। আফ্রিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশগুলির অন্যতম মিশর ২০২৩ সালে মোদীজীকে এই সম্মানে ভূষিত করে। আফ্রিকার সমৃদ্ধ দেশ নাইজেরিয়া মোদীজীকে দিয়েছে 'গ্র্যান্ড কমান্ডার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য নাইজার' পুরস্কার। নামিবিয়া তাদের দেশের সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মানে ভূষিত করে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে।

২০২৩ সালে প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভিন্ন দেশ সফরের সময় ফিজি মোদীজীকে তাদের 'অর্ডার অফ ফিজি', পাপুয়া নিউ গিনি 'অর্ডার অফ লোগোহু' এবং পালাউ তাদের সর্বোচ্চ সম্মান 'এবাক্ল অ্যাওয়ার্ড' দেয়। এভাবেই জলবায়ু পরিবর্তনের লড়াইয়ে ভারতের নেতৃত্বকে কুর্নিশ জানায় ছোট্ট ছোট্ট এই দেশগুলি।

বিভিন্ন দেশের জাতীয় সম্মাননার পাশাপাশি বিশ্বমঞ্চে পরিবেশ রক্ষা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নে অবদানের জন্য বেশ কিছু বিখ্যাত আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন মোদীজী। ২০১৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাঁকে প্রদান করে 'চ্যাম্পিয়ন্স অফ দ্য আর্থ অ্যাওয়ার্ড'। আন্তর্জাতিক সৌর জোট গঠনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসারে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এই সর্বোচ্চ পরিবেশ সম্মাননা প্রদান করে। ২০১৮ সালে সিওল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয় মোদীজীকে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও বিশ্ব অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদানের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার এই বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান পুরস্কৃত করে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে।

ভারতের কোটি কোটি মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' বা 'নির্মল ভারত' গড়ায় সাফল্যের জন্য বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস্ ফাউন্ডেশন মোদীজীকে ২০১৯ সালে দেয় গ্লোবাল গোলকিপার অ্যাওয়ার্ড।

প্রশ্ন হলো, কেন বিশ্বমঞ্চে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্ব ও মর্যাদা ক্রমশ বাড়ছে?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই দীর্ঘ পুরস্কারের তালিকা কেবল কিছু স্মারক বা পদক নয়। এটি গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমীকরণের বহিঃপ্রকাশ। জেনে নেওয়া যাক ঠিক কী কারণে বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হবে বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে ভারতের আত্মপ্রকাশের কথা। আজ ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি। এটি বিশ্বের প্রথম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ভারতের বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার, তরুণ শ্রমশক্তি এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বিশ্বের যে কোনও দেশের পক্ষেই অত্যন্ত লোভনীয়। ইউরোপ থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য— সব দেশই ভারতের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করতে এবং বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী। অর্থনৈতিক এই শক্তির কারণেই বিশ্বনেতারা ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তাঁদের দেশে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের সব চেয়ে বড়ো কূটনৈতিক সাফল্য হলো কোনো নির্দিষ্ট সামরিক বা রাজনৈতিক ব্লকের অনুগামী না হয়ে ভারতের জাতীয় স্বার্থকে সবার ওপরে রাখা। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনার মধ্যেও ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা অব্যাহত রেখেছে, আবার একই সঙ্গে আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সম্পর্ক আরও মজবুত করেছে। এই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ অবস্থানের কারণে সব পক্ষই ভারতকে সমীহ করে চলে।

'গ্লোবাল সাউথ' বা উন্নয়নশীল বিশ্বের নেতৃত্ব দেওয়ায়ও ভারতকে আজ সমীহ করে চলেন বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিধর দেশের রাষ্ট্রনেতারাও। আজ আর ভারত কেবল নিজের কথা বলে না, বরং আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে। 'জি-২০ সম্মেলন'-এর সভাপতিত্ব করার সময় ভারত আফ্রিকান ইউনিয়নকে এই জোটের স্থায়ী সদস্য পদ পাইয়ে দিতে ঐতিহাসিক ভূমিকা নির্বাহ করেছিল। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ছোটো ছোটো দ্বীপদেশগুলির পাশে দাঁড়ানো বা করোনা অতিমারীর সময় ১০০টিরও বেশি দেশে নিখরচায় প্রতিষেধক টিকা পাঠানো— ভারতের এই মানবিক কূটনীতি বিশ্বজুড়ে ভারতের ভাবমূর্তি নিয়ে গিয়েছে এক নয়া উচ্চতায়।

মনে রাখতে হবে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মোদীজীকে একজন দৃঢ়চেতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম নেতা হিসেবে দেখা হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ডিজিটাল পরিকাঠামোর বিপ্লব, কর ব্যবস্থার সংস্কার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের মতো পদক্ষেপগুলি বিশ্বমঞ্চে প্রশংসিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে তাঁর ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক ও অসাধারণ বাগ্মিতা বিশ্বনেতাদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে এক অনন্য প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে।

বস্তুত, মোদীজীর ঝুলিতে পড়া এই তিন ডজনেরও বেশি আন্তর্জাতিক পুরস্কার আসলে আধুনিক ভারতের অগ্রগতির প্রতীক। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কিংবা ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে ভারতের যে কূটনৈতিক অবস্থান ছিল, আজ একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এসে ভারত তার চেয়েও ঢের বেশি শক্তিশালী, আত্মবিশ্বাসী এবং প্রভাব বিস্তারকারী দেশে পরিণত হয়েছে।

বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে— আমেরিকা থেকে রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রশান্ত মহাসাগর— সব দেশের সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মাননা প্রদানের বিষয়টি প্রমাণ করে যে, আজকের ভারতকে বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতি বা অর্থনীতির কোনো সমীকরণই মেলানো সম্ভব নয়। মোদীজীর এই কূটনৈতিক দূরদর্শিতা ভারতকে কেবল বিশ্বমঞ্চে মর্যাদাপূর্ণ আসনেই বসায়নি, বরং আগামীদিনে ভারতকে এক প্রকৃত 'বিশ্ববন্ধু' বা বিশ্বমঞ্চের অভিভাবক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পথ মসৃণ করে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, মোদীজীর এই ঝুলি উপচে পড়া সম্মাননা প্রাপ্তি আপামর ভারতবাসীর কাছে এক পরম গর্বের অধ্যায়।

স্পেনে মরক্কোর আক্রমণ, ভারতকে সাবধান থাকতে হবে

সারা বছর সব দেশের বর্ডার পেরিয়ে দু' একজন মানুষ অন্য উন্নততর দেশে ঢোকার চেষ্টা করে বেআইনিভাবে। কিন্তু ৬০ হাজার মানুষের একসঙ্গে বর্ডার পেরিয়ে চলে আসাটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না।

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

কয়েকমাস আগে বার্সেলোনায় প্রায় পাঁচ লক্ষ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের স্পেন বৈধতা দিয়েছে সরকারিভাবে। রাস্তায় বেরলে ইউরোপ না পাকিস্তান বোঝা দায়। চারিদিকে কালো কাপড়ে ঢাকা নারী, কোলে একটি, সঙ্গে কয়েকটা বাচ্চা। রাস্তাঘাটে অপরাধ বেড়ে গেছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। চুরি, ছিনতাই, ছুরি মেরে হত্যা, জখম, সন্ত্রাস চলছে আল্লার নামে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে কোনো সরকারি অফিসে লাইনে পঞ্জাবি বা উর্দু শুনতে পাওয়া যায়। প্রচুর দোকানও এদের। ইনস্টাগ্রামে এই সংক্রান্ত ভিডিয়োগুলো দেখলে বোঝা যায়। যারা একেবারেই কাজ করে না, তাদেরও সরকার প্রতিমাসে ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ (দেশের উপর নির্ভর করে) টাকা দেয় সংসার চালাতে। এদেরকে 'অ্যাসাইলাম সীকার' অর্থাৎ আশ্রয়প্রার্থী বলা হয়। লক্ষ লক্ষ এরকম লোকজন আছে যারা শুধু ভোটব্যাংক, ঠিক যেমন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জি বাংলাদেশ থেকে বেড়া ডিঙিয়ে অনুপ্রবেশকারী এনে তাদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড করে দিতেন গদিতে টিকে থাকতে। স্পেনে এখন বামপন্থী সরকার এই অবৈধ মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়ে তাদের ভোটে ক্ষমতায় টিকে আছে।

গত ৩০-৩১ জুলাই প্রায় ৬০ হাজার অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মরোক্কো থেকে স্পেনে ঢোকায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন স্পেনকে বেশ চাপে ফেলেছে। ইতালি ইতিমধ্যে স্পেনের সঙ্গে শেনজেন চুক্তি সাময়িকভাবে রদ করে দিয়েছে। এই অবৈধ ভাবে অনুপ্রবেশ নতুন কিছু নয়। বছর বছর ধরে চলে আসছে। বিগত কয়েক বছরে লক্ষ লক্ষ মুসলমান ঢুকেছে এভাবে কখনো জলপথে উত্তর আফ্রিকা হয়ে, কখনো স্থলপথে বর্ডার ক্রস করে। এর ফলে ইউরোপীয় অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে। একজন স্পেন-প্রবাসী বাঙ্গালি মহিলা জানাচ্ছেন, 'গতবার আমার স্বামীর জন্মদিনে ইতালির রোমে গিয়েছিলাম সেলিব্রেট করতে, এবার নেপলস্ যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, হয়তো হবে না এই চুক্তিভঙ্গের জন্য।'

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয়রা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন না করে। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে পাকিস্তানি গ্রুমিং গ্যাং বিগত কয়েক বছর ধরে ২,৫০,০০০ মহিলাকে ধর্ষণ করেছে, বাচ্চারাও রয়েছে। খবরগুলো দেখলে গা শিউরে ওঠে। ইংল্যান্ডের ৭২টা স্কুলে কোনো ইংরেজ ছাত্র-ছাত্রী নেই, ৪৫৪টা স্কুলে ইংরেজ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২ শতাংশের কম। সাদা চামড়ার ছাত্রেরা এখন সংখ্যালঘু সেখানে। মুসলমান নেতা মামদানি নিউইয়র্ক সিটির মেয়র হওয়ার পর থেকে রাস্তায় রাস্তায় মিছিলে স্বর উঠছে— আমেরিকায় খুব শীঘ্রই ইসলামের আধিপত্য হবে।'

ভারতে দেশভক্ত সরকার রয়েছে বলে খানিক ভালো আছে দেশবাসী। যেদিন কংগ্রেস বা অন্য দল ক্ষমতায় ফিরবে কী ভয়ানক অবস্থা হবে! এদের মুসলমান প্রীতি সম্পর্কে ভাবতে হলে বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশের মুসলমান প্রীতি তথা অনুপ্রবেশকারী সম্পর্কিত খবরে চোখ রাখতে হবে। পাকিস্তান থেকে বালুচিস্তান আলাদা হতে চাইছে, পিওকে আলাদা হতে চাইছে। বিভিন্ন মুসলমান অধ্যুষিত দেশের সঙ্গে ইহুদি, খ্রিস্টানদের যুদ্ধ বহু বছর ধরে চলে আসছে। ধর্মান্তরণ করিয়ে এরা সারা বিশ্বকে চরম নোংরা বানিয়ে ফেলেছে। ৫৭টা মুসলমান দেশ কম নয়। হিন্দুরা সচেতন না হলে হয়তো এজন্যই একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে।

প্রখ্যাত ভাষ্যকার সুদীপ্ত গুহ লিখেছেন, ''মরক্কোর মুসলমান অনুপ্রবেশকারী এবং তৃতীয় বিশ্ব থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া তথাকথিত 'ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স' এক্সপার্টদের মূল জীবন দর্শন কিন্তু এক। এরা জানেন এদের তত্ত্ব মানব সমাজের উপকারে আসতে পারে না। এরা জানেন পৃথিবীতে ভালো থাকার একমাত্র রাস্তা গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মুক্তবাজার; অথচ তারা তা বিশ্বাস করে না বলে দাবি করে এসেছে। এরা জানেন এদের পথের গন্তব্য একমাত্র নরক। চীন, উত্তর কোরিয়া থেকে ৫৭টি ইসলামি দেশ সবই নরক। তাই সিরিয়া, মরক্কো, গাজা কিংবা জিনজিয়াঙে অত্যাচারিত হওয়া মুসলমান ৫৭টি দেশে আশ্রয় চায় না, কিংবা মুসলিম ব্রাদারহুডে বিশ্বাসী ওই ৫৭টি দেশও তাঁদের জায়গা দেয় না। চীন, উত্তর কোরিয়া, কিউবার কুশাসন থেকে পালিয়ে লোকজন সোভিয়েত বা পূর্ব ইউরোপে আশ্রয় নেয়নি। নিয়েছে গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় ইউরোপ কিংবা আমেরিকায়। কারণ তারা জানে কমিউনিস্ট দেশ মাত্রই তাদের দেশের মতোই নরক। অমর্ত্য সেন, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়রা ভরসা করতে পারেনি ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতন্ত্রকে কিংবা তৎকালীন ভারতের গুরু সোভিয়েত রাশিয়াকে বা চারু মজুমদার, প্রমোদ দাশগুপ্তের গুরু চীনকে। তারা পাড়ি দেন সোজা আমেরিকা। কিন্তু সেখানে গিয়ে কী করেন এরা?

মুসলমানরা ইসলামিক জগতের কুশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে ভারত, ইউরোপ বা আমেরিকায় চলে গিয়ে সেখানে আবার দাবি করে শরিয়তি আইন প্রতিষ্ঠার। আর অমর্ত্যবাবু, অভিজিৎবাবুরা ওই দেশের টাকায় ওখানে বসে ওদের ডোবানোর জন্যে গবেষণা করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন ওদের মডেল ভুল এবং রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া বা নেহরুর আর্থিক মডেল ঠিক। এ এক অদ্ভুত মানসিক রোগ। কিংবা শয়তানি।''

বেশিরভাগ দেশেই পাঁচিল বা কাঁটাতারের বর্ডার নেই, যেমন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে, তাই এই অনুপ্রবেশ ধরে ফেলা সহজ নয়। আর সত্যি কথা বলতে দেশগুলির সরকার সব জানলেও

ফঃ ২

বিশেষ কিছু করে না, একটাই কারণ এখানে লেফটিস্ট সরকার। অনুপ্রবেশকারীদের বৈধতা দিয়ে ভোট নিয়ে টিকে আছে। হাজার হাজার মুসলমান যুবককে ট্রাকে করে মরক্কো-স্পেন সীমান্তে আনা হয়েছিল। যারা গত ৩০ জুলাই বিনা বাধায় স্পেনে প্রবেশ করেছে। পুরো প্রক্রিয়াটি সুপরিকল্পিত এবং মরক্কো সরকারের প্রশাসনিক সহায়তায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

স্পেনে হঠাৎ করে ৫০-৬০ হাজার মানুষ মরক্কো থেকে ঢুকে পড়ার ঘটনা সম্পর্কে অনেকেই জানতে চাইছেন। প্রথমেই দেখা যাক কোথায় ঘটনাটা ঘটেছে আর তার কী ইতিহাস। তারপর আসা যাক কী ঘটেছে ও কেন ঘটেছে।

ঘটনা ঘটেছে স্পেনের সেউটা শহরে। যেটা ভৌগোলিকভাবে আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরে মরক্কোর ঠিক পাশেই। স্পেন বা ইউরোপ থেকে আলাদা ভূখণ্ড। এই সেউটা অনেকটা ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে থাকা ছিটমহলের মতো। স্পেনের মূল ভূখণ্ডে না হয়েও তা স্পেনের অংশ। মরোক্কোর এক পাশে অবস্থিত আর মরক্কোর দাবি সেউটা তাদের অংশ, স্পেন নাকি জোর করে দখল করে রেখেছে। অনেকটা ভারতের পিওকে-র দাবির মতো।

১৪১৫ সালে পর্তুগাল তৎকালীন মরোক্কোর মানিনিদ সুলতানের থেকে যুদ্ধ করে দখল করে নেয় মরোক্কোর এই সেউটা শহরকে। এরপর ১৫৭৮ সালে পর্তুগালের রাজা সেবাস্তিয়ান মারা যায়। কিন্তু রাজা সেবাস্তিয়ানের কোনো উত্তরাধিকার না থাকায় সেবাস্তিয়ান পরিবারের আত্মীয় স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ পর্তুগালের রাজত্বের দায়িত্ব পান। তখন সেউটা-সহ পর্তুগাল ও স্পেন একই রাজার অধীনে। ফলে সেউটা তখন আইনত স্পেনের অধীনস্থ শহর। এরপর ১৬৪০ সালে পর্তুগাল আলাদা হতে চেয়ে স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে। ১৬৬৮ সালে স্পেন পর্তুগালকে আলাদা দেশ হিসেবে ঘোষণা করে। কিন্তু সেউটা স্পেনের অধীনেই থেকে যায়। মরোক্কো ও স্পেনের মধ্যে সীমানা নিয়ে অনেক চুক্তি আছে যেখানে মরক্কোরও দায়িত্ব যাতে কেউ মরোক্কো থেকে সেউটা ঢুকে পড়তে না পারে।

গত কয়েকদিনে মরক্কো থেকে বর্ডার ক্রস করে কাতারে কাতারে অনুপ্রবেশকারীরা ওই সেউটাতে ঢুকে পড়েছে। অনেকে সমুদ্র পেরিয়ে আসার সময় জলে ডুবে মারা গেছে। সেউটা ও মরক্কোর মধ্যে স্থল সীমানা থাকতে সমুদ্র কেন পেরোতে হচ্ছে? কারণ স্থল সীমান্ত মাত্র ৮ কিলোমিটার যেটা কাঁটাতার দিয়ে বন্ধ করা বেশিরভাগ জায়গায়। যদি পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার মধ্যে বর্ডার কাঁটাতার দিয়ে সিল করে দেওয়া হয় তখন ওড়িশায় ঢোকার উপায় পশ্চিমবঙ্গের দীঘা থেকে সমুদ্রে সাঁতার কেটে ওড়িশার তালসারিতে উঠে পড়া। সেউটার ক্ষেত্রে এটা প্রায় ৫ কিলোমিটার সমুদ্রপথ। সেটা পেরোতে গিয়ে অনেকেই জলে ডুবে মারা গেছে। বর্তমান স্প্যানিশ সরকার বর্ডারে সীমান্তরক্ষী কর্মী বাড়িয়েছে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের তাদের নিজেদের দেশে ফেরানোর কাজ শুরু করেছে।

এনিয়ে বিশ্বরাজনীতিতে প্রচুর আলোচনা চলছে। ট্রাম্প বলেছেন স্পেনের সরকার এর জন্য দায়ী। এটা ঠিক যে স্পেন সরকার বরাবরই অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে নরম মনোভাব দেখিয়ে এসেছে ইউরোপের অন্যান্য অনেক দেশের মতোই। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি একধাপ এগিয়ে বলেছেন স্পেনকে শেনজেন চুক্তি থেকে বের করে দেওয়া হোক, কারণ স্পেন ইচ্ছা করে তাদের বর্ডার দিয়ে অনুপ্রবেশকারী ঢুকিয়ে ইউরোপে ছড়িয়ে দিচ্ছে যা ইউরোপের অর্থনীতিতে খারাপ প্রভাব ফেলছে।

এখন বুঝতে হবে এটা স্পেন সরকার নিজে করছে নাকি এর পিছনে অন্য কোনো ষড়যন্ত্র আছে। প্রথম কথা, হঠাৎ ১/২ দিনে ৬০ হাজার মানুষ কেন বর্ডার পেরোতে চাইছে? সারা বছর সব দেশের বর্ডার পেরিয়ে দু' একজন মানুষ অন্য উন্নততর দেশে ঢোকার চেষ্টা করে বেআইনিভাবে। কিন্তু এই ৬০ হাজার মানুষের একসঙ্গে চলে আসাটা কোনো কাকতালীয় হতে ঘটনা পারে না। কেউ তো সংগঠিত করেছে এদের! কারা তারা? শোনা যাচ্ছে বর্ডার অবধি আসার জন্য মরক্কো সরকারের পক্ষ থেকে নাকি বাস লরির ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং মরক্কোর সীমান্ত পুলিশ সীমান্তের গেট খুলে দিয়ে চুপচাপ বসে দেখছিল। বোঝাই যায় মরক্কোর সরকার বা মরক্কোর ভিতরে কোনো সংস্থা এই পরিকল্পনা করেছে, ব্লু-প্রিন্ট বানিয়ে এই কাজ সংঘটিত করেছে।

এখন প্রশ্ন মরক্কো কেন এটা করবে? প্রথমত, মরক্কোর অর্থনীতির তুলনায় ইউরোপের অর্থনীতি, চাকরি বা কাজ পাওয়ার সুযোগ ও মানুষের জীবনযাপনের মান অনেক উন্নত। তাই অনেক মানুষ ইউরোপে চলে আসতে চায়। মরক্কো থেকে কিছু মানুষ ইউরোপে চলে গেলে মরক্কোর জনসংখ্যা কমবে। এছাড়া সেউটা ভূখণ্ডের মালিকানা নিয়ে তো মরক্কোর দীর্ঘদিনের দাবি রয়েছে। সেই দাবি স্পেন মানছে না, তাই স্পেনকে বিভিন্ন ভাবে নাকাল করা যাতে স্পেন ভাবে সেউটা মরক্কোকে ছেড়ে দিলে এই ধরনের উৎপাতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

এছাড়াও মরক্কোর আর একটা বড়ো স্বার্থ আছে। তা হলো আমেরিকা। তাছাড়া গত ২০ বছর ধরে মরক্কোর ক্ষমতায় আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘনিষ্ঠ সরকার। ট্রাম্প শুল্কের ক্ষেত্রেও মরক্কোকে অনেক কিছুতে ছাড় দিয়েছেন। তাই প্রভুভক্তি উথলে পড়েছে। এখানে ট্রাম্পের যে স্পেনের প্রতি বিরাট রাগ তার কারণ ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ট্রাম্প স্পেনের সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করতে চাইলে স্পেন মুখের উপর না বলে দেয়। ভারতকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে। ভারতে স্থলপথে অনেক ছিদ্র আছে। আর আছে বিশাল উপকূল পথ। কাজেই অবিলম্বে স্থলসীমান্ত বন্ধ ও জল সীমান্তে কড়া নজরদারি করতে হবে। ভারত দখল করতে না পারুক অনুপ্রবেশকারীরা অন্তত ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে তো পারবে। এক হল্যান্ড প্রবাসী বাঙ্গালি লিখেছেন,

'আমাদের দেশে এখন যেটা হচ্ছে সেটা মোটেও ভালোর দিকে যাচ্ছে না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, ইংল্যান্ড-সহ সকলেই জানে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের ওরা আশ্রয় দিয়ে কতো বড়ো ভুল করেছে। ওরা আশ্রয় চেয়ে যে দেশে ঢোকে সেই দেশকেই আজ হুমকি দিচ্ছে। ডেনমার্ক, স্পেন, জার্মানি, ইংল্যান্ড সকলেই আজ নাজেহাল। ...আমি কোনো উপাসনা পদ্ধতির মানুষকে ছোটো না করেই বলছি, ওরা ৯৮ শতাংশ বেইমান। পাশের দেশ বাংলাদেশ, পকিস্তানে হিন্দুদের অবস্থা দেখুন তাহলেই বুঝবেন। ওদের মধ্যে মানবতা বোধের ছিটে ফোঁটাও নেই। তাই বলছি সময় থাকতে থাকতে সাবধান হন।'

স্পেন একদা মুসলমানদের দখলে ছিল। ইসাবেলা ও ফার্দিনান্দ ১৪৯২ সালের ২ জানুয়ারি ওদের তাড়িয়েছিল। তার জ্বালা মুসলমানদের আজও মেটেনি। □

আনন্দমঠ ও বন্দে মাতরম্-এর আলোকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রভাবনা

সঙ্ঘমিত্রা সরকার কবিরাজ

বন্দে মাতরম্ সূত্র। আনন্দমঠ তার ব্যাখ্যা। আনন্দমঠে দেশমাতৃকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে মাতৃত্ব ও দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে তা তৎকালীন ভারতবাসীর কাছে যেন সম্পূর্ণ নতুন ছিল।

আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে বন্দে মাতরম্ দিয়েই শুরু করব। বন্দে মাতরম্-এর আক্ষরিক অর্থ মায়ের বন্দনা।

এই মা কি জননী, জন্মভূমি নাকি কোনো দেবী মা? 'বন্দে মাতরম্' স্বদেশ মন্ত্র, মাতৃ বন্দনার মহাসঙ্গীত। এই মাতা নিঃসন্দেহে জননী জন্মভূমি দেশমাতৃকা। মাতৃভক্ত সন্তানদের একমাত্র আরাধ্যা। যাঁর মধ্যে দশপ্রহরণধারিণী শ্রীশ্রীদুর্গার শক্তি, কমলদলবিহারিণী মাতা লক্ষ্মীর বৈভব, বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতীর জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের এক অপূর্ব সমন্বয় প্রকাশিত হয়েছে ।

এতদিন ধরে গানটি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহমূলক অথবা দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে ভক্তিগীতি বা হিন্দু দেবীর বন্দনা রূপে জনমানসে প্রচলিত ছিল। তাহলে বন্দে মাতরম্ কি রণধ্বনি? ১৯০৬ সালে ১৮ নভেম্বর লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের সভাপতিত্বে বোম্বাই নগরীতে অনুষ্ঠিত এক বক্তৃতায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— 'বন্দে মাতরম্ আমাদের জাতীয় ধ্বনি। ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে শান্তি, শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার ধ্বনি। রণধ্বনি নয়।' বন্দে মাতরম্ গানটি নিয়ে নানা দেশে যেভাবে আলোচনার ঝড় এমনকী সুদূর ইংল্যান্ডের মাটিতেও যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল সম্ভবত পৃথিবীর আর কোনো সঙ্গীত সম্পর্কে তা হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখনীয়, বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৫৩ টি দেশের দেড় লক্ষের বেশি মানুযের মতামতের ভিত্তিতে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক জনপ্রিয় জাতীয় সঙ্গীতের শিরোপা পায় বন্দে মাতরম্।

কর্মাধ্যক্ষ রামচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে এসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ মাঝেমধ্যেই নিয়ে যেতেন। এরকমই একদিন এসেছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার টেবিলে তখন একটি কাগজ পড়েছিল তাতে বন্দে মাতরম্ গানটি লেখা ছিল। পণ্ডিতমশাইয়ের নজরে পড়লে তিনি বললেন— 'বিলম্বে প্রবন্ধ লইলে কাজ বন্ধ থাকিবে এই যে গীতিটি লেখা আছে উহা মন্দ নয়— ওইটা দিন না কেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ কাগজটি টেবিলের দেরাজে পুরে রেখে বললেন— 'উহা ভালো কী মন্দ এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না.. কিছুকাল পর উহা বুঝিবে। আমি তখন জীবিত থাকিব না, তুমি থাকিতে পারো।'

বন্দে মাতরম্ রচিত হওয়ার পরে যদুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় প্রথম গানটি করেছিলেন। এই গান সম্বন্ধে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন— 'এই গীতের মহিমা সমগ্র ভারতকে মাতাইয়া তুলিবে, সমস্ত দেশ প্লাবিত করিবে, প্রথমে কিছু অনিষ্ট হয়তো-বা হইবে, কিন্তু আর ২৫ বৎসর পর অবশ্যই সুফল ফলিবে।' তখনই তিনি বলেছিলেন— 'আমি অদ্যাবধি যাহা লিখিয়াছি তাহাতে বঙ্গ সংসারের কিছুই উপকার হয় নাই বরং ক্ষতি হইয়াছে, আমি এইবার যাহা লিখিবো তাহাতে দেশের যথার্থ উপকার হইবে।'

প্রখ্যাত মনীষী বিনয় কুমার সরকারের মতে— 'বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের দেবী বিভিন্ন হিন্দু দেব-দেবীর অন্যতম নন। এই দেবী জল মাটির দেবী, পাহাড়ের দেবী, নদ-নদীর দেবী, সমগ্র দেশই সাক্ষাৎ দেবী।' ঋষি বঙ্কিম দর্শনে সমাজসেবা বা মানবপূজা এখানে সরস মূর্তি লাভ করেছে। স্বদেশ পূজা প্রবর্তক ঋষি বঙ্কিম নবীন অধ্যাত্ম জীবনের ভগীরথ।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচিত আনন্দমঠ উপন্যাসে মাতৃভূমিকে মহাশক্তির প্রতীক রূপে বন্দনা করেছেন। আনন্দমঠের মা ছিলেন জগদ্ধাত্রী, হয়েছেন কালী, হবেন দশভুজা গৌরী নারায়ণী। জগজ্জননী আদ্যাশক্তি মহামায়ার সঙ্গে দেশমাতৃকাকে এক করে শক্তি বন্দনার এমন নজির একমাত্র ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসেই দেখতে পাওয়া যায়। তবে আনন্দমঠ উপন্যাসে মায়ের এই ত্রিমূর্তি ব্যতীত আরেকটি মূর্তি আছে। উপন্যাসটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন ঔপন্যাসিক চিরকালীন মাতৃমূর্তি বর্ণনা করেছেন এইভাবে— 'শ্রীবিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্তি' যিনি দেবী লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্যান্বিতা। এই মাতৃমূর্তি সম্পূর্ণভাবে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব কল্পিত।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর মত— মা যখন কালাধীন ,তখন তাঁর তিন রূপ। জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গা— তিনি তখন বঙ্গমাতা বা ভারতমাতা; আর যখন তিনি কালাতীত তখন তিনি শাশ্বত মূর্তি, তিনি জগৎপালক শ্রীবিষ্ণুর অঙ্কাশ্রিতা ধরণী— 'ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্'। সন্তানরা ষড়ৈশ্বর্যশালী রাজনীতিবিদ শ্রীবিষ্ণুর উপাসক। যতবার প্রয়োজন পড়েছে তিনি সৃষ্টি রক্ষার্থে অবতাররূপে প্রকট হয়েছেন। ধরণীর

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কবি হেমচন্দ্রকে বলেছিলেন— 'তুমি কি বলিতে চাও সাহিত্য দ্বারা কার্যত দেশের কোনো মঙ্গল হয় না— যদি তা বলো, তাহা হইলে আমি তোমার কথা কখনো অনুমোদন করিতে পারি না। যদি সাহিত্য দ্বারা স্বদেশের মঙ্গল সাধন করা না যায় মনে করিতাম তাহা হইলে আনন্দমঠ লিখিতাম না। আমার বিশ্বাস আমার আনন্দমঠে স্বদেশের একদিন উপকার হইবে।'

শত্রু মধু-কৈটভকে হত্যা করে ভগবান শ্রীবিষ্ণু ধরণীকে রক্ষা করেছেন এবং নিজের কোলে আশ্রয় দিয়েছেন।

বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন— আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকাকে মহাবিশ্ব বা নারায়ণের অঙ্কে স্থাপন করে আমাদের দেশপ্রীতি ও স্বদেশ সেবাব্রতকে সাধারণ মানব প্রীতি ও বিশ্বমানবের সেবাদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। বিশ্ব মানবকে বাদ দিয়ে দেশমাতৃকার পূজা হয় না— এটা আনন্দমঠের প্রধান কথা। শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন— 'বঙ্কিমবাবুর পূর্বে আর কেহ কখনো স্বদেশকে শ্রীবিষ্ণুর অঙ্কস্থায়িনী মোহিনী মূর্তি মাতৃরূপে কল্পিত করিয়া স্বদেশভক্তিকে এত উচ্চাসনে উন্নীত করিয়াছিলেন কিনা জানি না।'

'বাঙ্গলার ইতিহাস' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন— বাদশা আকবরের বঙ্গ বিজয়ের ফলে বাংলাদেশ পরাধীন হয়। আকবর হলেন বাঙ্গলার কাল। তিনিই প্রথম বাঙ্গলাকে প্রকৃত পরাধীন করেন। যেদিন হইতে বাঙ্গালা দিল্লির মোগলের সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়া গেল সেদিন হইতেই বাঙ্গলা দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল। সেদিন হইতে বাঙ্গলার ধন আর বাঙ্গলায় রহিল না। দিল্লি বা আগ্রার ব্যয় নির্বাহ কর্মে প্রেরিত হইতে লাগিল। বাঙ্গলার গৌরব মোগল কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে।' আনন্দমঠ উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে মূলত সেই আক্ষেপ তিনি নিবারণ করতে চেয়েছেন।

উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি তিনটি স্তর দেখতে পাই। সাধারণ উপন্যাসিক স্তর, লৌকিক সাংসারিক শিক্ষার স্তর ও আধ্যাত্মিক স্তর। ভারতের ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো— আধ্যাত্মিক নবজাগরণ। ভারতীয় ইতিহাসে বারবার ধর্মীয় বিপ্লবের পরে সাধিত হয়েছে রাজনৈতিক বিপ্লব। প্রাচীন ভারত থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবোধের জন্ম ও জাতীয় আন্দোলনের প্রসার— সব ক্ষেত্রে সেই একই ইতিহাস। বঙ্গে নতুন করে নবজাগরণ শুরু হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ভাবান্দোলনের মধ্যে দিয়েই। শিখ রাজনৈতিক ও সামাজিক জনজাগরণের সূচনা করেছিলেন গুরু গোবিন্দ সিংহ। গুরু সমর্থ স্বামী রামদাস ছাড়া শিবাজী হিন্দুরাষ্ট্রচেতনার কথা হয়তো ভাবতেই পারতেন না।

আনন্দমঠ উপন্যাসে তাই সন্ন্যাসী সঙ্ঘের বীর সদস্যদের একমাত্র পরিচয় হলো— সন্তান দল। এই সন্তান দলের একমাত্র লক্ষ্য হলো দেশমাতৃকার কল্যাণ। তাঁর শৃঙ্খলমোচন। তাঁর মুক্তি সাধন। স্বাধীন দেশের নতুন বিজয় পতাকা উড্ডীন করা। তাঁদের একমাত্র চিন্তা, কর্ম, সাধনা-আরাধনা মাতৃমূর্তি ভারতভূমির কল্যাণ। এঁরা সর্বত্যাগী, নিরাভিলাষী, রজগুণোপাসক, বীর হৃদয়। দেশমাতৃকার গৌরবময় মূর্তি তাঁদের একমাত্র কামনা, বাসনা ও সাধনা। মহেন্দ্রর প্রশ্নের উত্তরে ভবানন্দ বলছেন— 'যে রাজা রাজ্য পালন করে না সে আবার রাজা কী?' এই কারণেই তাঁরা বলতে পারে— 'আমরা অন্য মা মানি না, জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরিয়সী— আমরা বলি জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা সুফলা মলয়জ সমীরণ শীতলা শস্যশ্যামলা...মা।' এর চেয়ে বড়ো রাষ্ট্রচেতনা আর কী হতে পারে?

আনন্দমঠ উপন্যাসে অধিপতি বা নেতা কেমন হবেন সেটাও পরিস্ফুটিত হয়েছে সত্যানন্দ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। তিনি তপোনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী। যথার্থ অনন্য মাতৃব্রত তাঁর সাধনা। তাঁর চিরজীবনের অনুষ্ঠেয় ব্রত। তাঁর স্বার্থত্যাগের তুলনা নেই। সন্তান দলের বিজয়ের পর জীবনানন্দ প্রমুখ সন্তানগণ তাঁকে রাজ মুকুট পরাতে গেলে তিনি ঘৃণার সঙ্গে বলেছেন— 'আমাকে কি শূন্য কুম্ভ মনে করো?' বিজয়ের পর মহাপুরুষের আহ্বান মাত্র সত্যানন্দ বলেছেন— 'আমি প্রস্তুত আছি।'

আবার আনন্দমঠ উপন্যাসে যে দু'টি প্রধান নারী চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা এই উপন্যাসকে অনন্য মাত্রা দান করেছে এবং স্বদেশ উদ্ধারের ক্ষেত্রে দেশ কল্যাণে ও দেশ সেবায় নারীদের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত তা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত হয়েছিল— 'বাঙ্গালি স্ত্রী অনেক অবস্থাতে বাঙ্গালির প্রধান সহায় অনেক সময় নয়।' এটি বোঝাতে গিয়ে তিনি দু'টি নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন— প্রথমটি শান্তি এবং দ্বিতীয়টি কল্যাণী।

কল্যাণী চরিত্রটি গভীরভাবে পঠন করলে আমরা বুঝতে পারি তেজস্বিতা, সংযম শিক্ষা, কর্তব্য জ্ঞান কল্যাণীর চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। কল্যাণী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র যেটি বোঝাতে চেয়েছেন তা হলো প্রত্যক্ষভাবে স্বামীর ধর্মের সহায় না হয়েও স্বামীর আচরিত ধর্মের পূর্ণ সহায়ক হওয়া যায় এবং আপন ধৈর্য, শিক্ষা ও সংযমের উপর ভরসা রেখে সহধর্মিণীর মান রাখতে পারা যায়। যে রমণী কোনোপ্রকারেই স্বামীর ধর্মের বিঘ্নকারিণী হন না, তিনি অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করেন।

আবার শান্তি চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারী গঠনমূলক পথে বিঘ্ন বা সৎকর্মে বাধাস্বরূপ— এই প্রবাদের বিরুদ্ধে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র শান্তি চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। শান্তি এখানে স্বামীর পাশে থেকে সহযোদ্ধা হয়ে, মানসিক শক্তির সহায় হয়ে সহধর্মিণীর দায়িত্ব পালন করেছে। আমাদের ভারতবর্ষের নারী সমাজ যদি এইভাবে নিজেকে গঠন করতে পারে তাহলে স্বদেশের মঙ্গল ও হিতসাধন অবশ্যই হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য— রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি কাব্যগ্রন্থে সবক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, নারীরা পুরুষের আচরিত ধর্মের সহভাগী।

সমগ্র উপন্যাসটি স্বদেশচর্চার নতুন আদর্শ ও নতুন দর্শনের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে দেশাত্মবোধের এক নতুন আদর্শ ও রাষ্ট্রদর্শন তুলে ধরেছেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। দেশপ্রেমের জাগরণই হলো আনন্দমঠের প্রধান অবদান; পরাধীন দেশে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের প্রথম প্রকাশ। শুধু তাই নয় জননী-জন্মভূমির সেবা নিরন্তর করে যেতে হয়। তাই উপন্যাস শেষে 'জীবনানন্দ ও শান্তি চলিলেন হিমালয় কুটির প্রস্তুত করিয়া যাতে মা-র মঙ্গল হয় সেই প্রার্থনা করিতে।' এমনকী সত্যানন্দ মহাপুরুষের সঙ্গে একই পথে অগ্রগমন করেছেন। এই শিক্ষা অতীব সুমহান। শুধু প্রাণ উৎসর্গ করলে হবে না, দেশের মঙ্গলের জন্য চিরকালীন প্রার্থনা ও আরাধনা করে যেতে হবে। তবে মাতৃ-আরাধনা শত শত কর্ম হতে শক্তিশালী ও ফলবতী হবে। তাই তো বন্দে মাতরম্।

সবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ উপন্যাসের বিষয়ে কবি হেমচন্দ্রের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তাই দিয়ে এই নিবন্ধের উপসংহার উপস্থাপিত হলো। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কবি হেমচন্দ্রকে বলেছিলেন— 'তুমি কি বলিতে চাও সাহিত্য দ্বারা কার্যত দেশের কোনো মঙ্গল হয় না— যদি তা বলো, তাহা হইলে আমি তোমার কথা কখনো অনুমোদন করিতে পারি না। যদি সাহিত্য দ্বারা স্বদেশের মঙ্গল সাধন করা না যায় মনে করিতাম তাহা হইলে আনন্দমঠ লিখিতাম না। আমার বিশ্বাস আমার আনন্দমঠে স্বদেশের একদিন উপকার হইবে।' □

স্বদেশী অর্থনীতি

শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর ভারতের রোডম্যাপ

ডঃ সুতনু সামন্ত

ভারত তার অর্থনৈতিক জয়যাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতের লক্ষ্য ২০৪৭ সালে 'বিকশিত ভারত' (Developed India) তৈরি করা। এর জন্য প্রয়োজন : শক্তিশালী দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা, বিশ্বমানের শিল্প, প্রতিযোগিতামূলক উদ্যোগ, শক্তিশালী সরবরাহ শৃঙ্খল প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, উৎপাদনশীল ও উন্নত কৃষিব্যবস্থা, দক্ষ মানবসম্পদ এবং দেশের বিপুল যুবসমাজের জন্য পর্যাপ্ত এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান। এই প্রেক্ষাপটে স্বদেশী অর্থনীতি একটি শক্তিশালী আত্মনির্ভর ও সক্ষম ভারত তৈরির অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে।

স্বদেশী মানে বিদেশি প্রযুক্তি, বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে প্রত্যাখ্যান করা নয়। আধুনিক স্বদেশী অর্থনীতির লক্ষ্য হলো— প্রথমে দেশের নিজস্ব উৎপাদন এবং সক্ষমতাকে শক্তিশালী করা, তারপর বিশ্ববাজারে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল ভারতীয় উদ্যোক্তা, শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। স্বদেশী অর্থনীতির লক্ষ্য : ভারতে উৎপাদন, ভারতে মূল্য সংযোজন (Value Addition), ভারতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ভারত থেকেই বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা, স্বদেশী অর্থনীতির দ্বারা ভারতের শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

১. স্বদেশী অর্থনীতি : আবেগ থেকে অর্থনৈতিক কৌশল :

ঐতিহাসিকভাবে 'স্বদেশী ধারণা' দেশীয় পণ্যব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিতে স্বদেশীকে একটি বৃহত্তর ও সুসংহত অর্থনৈতিক কৌশলে পরিণত করতে হবে। আধুনিক স্বদেশী অর্থনীতির লক্ষ্য : (ক) দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, (খ) MSME-কে শক্তিশালী করা, (গ) ভারতীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা, (ঘ) দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশ, (ঙ) কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, (চ) খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পের হ্রাস, (ছ) অপ্রয়োজনীয় আমদানি কমানো, (জ) মূল্য সংযোজিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি, (ঝ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি, (ঞ) বিশ্বমানের ভারতীয় ব্র্যান্ড তৈরি আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, আরও ভালো উৎপাদন, দ্রুত উদ্ভাবন এবং আরও বেশি রপ্তানি।

২. মেক ইন ইন্ডিয়া থেকে মেড ইন ইন্ডিয়া :

চীনকে সরিয়ে বিশ্বের অন্যতম প্রধান উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবে ভারতের আত্মপ্রকাশ করার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু এর জন্য শুধু ভারতে বিদেশি পণ্য ভারতে সংযোজন (Assembly) করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। ভারতকে আরও বেশি করে ভারতে নক্‌শা করা, ভারতে উৎপাদন করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন : (ক) বিনিয়োগ, (খ) গবেষণা ও উন্নয়ন,

(গ) ইঞ্জিনিয়রিঙের উন্নতি, (ঘ) শিল্পক্ষেত্রে অটোমেশন, (ঙ) সেমিকনডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স শিল্পের দ্রুত প্রসার, (চ) বায়োটেকনোলজি এবং ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের দ্রুত উন্নতি, (ছ) খাদ্য প্রযুক্তির বিকাশ, (জ) প্রতিরক্ষাতে নতুন নতুন উৎপাদন, (ঝ) পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ, (ঞ) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল প্রযুক্তির উদ্‌ভাবন ও প্রসার। আমাদের লক্ষ্য ভারতে নক্‌শা— ভারতে উদ্‌ভাবন— ভারতে তৈরি— ভারত থেকে বিশ্ববাজারে রপ্তানি।

৩. MSME : স্বদেশী অর্থনীতির চালিকা শক্তি :

MSME বর্তমানে উৎপাদন খাতে সমস্ত উৎপাদনের প্রায় ৬০ শতাংশ অবদান রাখে এবং ভারতের সমস্ত রপ্তানির প্রায় ৪৫ শতাংশ MSME সেক্টর থেকে আসে। তাই 'MSME'-কে আরও শক্তিশালী এবং বিস্তৃত করার জন্য সরকার এবং দেশের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। একটি শক্তিশালী 'MSME' ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন : (ক) সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী ঋণ, (খ) আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং উন্নত প্রযুক্তি, (গ) মাননিয়ন্ত্রণ এবং সার্টিফিকেশন, (ঘ) পরীক্ষাগার ও Testing সুবিধা, (ঙ) ডিজিটাল বিপণন এবং ই-কর্মাস, (চ) দক্ষ মানবসম্পদ, (ছ) আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ, (জ) রপ্তানিতে সহায়তা, (ঝ) মেধাস্বত্ব সুরক্ষা।

৪. কৃষিতে শুধু উৎপাদন নয়, মূল্যসংযোজন দিকে নিয়ে যেতে হবে :

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। আজও ভারতের ৬০ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষিজপণ্য সরাসরি রপ্তানি হলে উৎপাদকেরা তুলনামূলকভাবে কম মূল্য পান। তাই কৃষির পরবর্তী বিপ্লব হওয়া উচিত মূল্যসংযোজন ভিত্তিক কৃষি অর্থনীতি।

পরিকল্পনাটি হতে পারে—

খামার□ প্রক্রিয়াকরণ□ প্যাকেজিং□ ব্র্যান্ডিং□ রপ্তানি।

শুধুমাত্র চাল, আম, মসলা, ফুল বা সবজি রপ্তানি না করে এগুলি থেকে তৈরি করা যেতে পারে— ফলের পাউডার, প্যাকেটজাত dehydrated সবজি, Ready to eat খাদ্য, মশলার বিশেষ মিশ্রণ, হার্বাল পানীয়, নিউট্রাসিউটিক্যাল, শুকনো সবজি, Biofortified Ceseals, ফুলভিত্তিক প্রক্রিয়াজাত পণ্য, প্রাকৃতিক নির্যাস, funetirnal food, আধুনিক প্যাকেজিংযুক্ত ঐতিহ্যবাহী পণ্য এই value added পণ্য তৈরি করে রপ্তানি করতে হবে। এতে কৃষকের আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ এলাকাতে প্রচুর কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হবে।

৫. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প : ভারতের জন্য বিশাল সম্ভাবনার ভাণ্ডার : খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্বদেশী অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে উঠতে পারে।

কৃষিপণ্য□ প্রযুক্তি□ খামার□ প্রক্রিয়াকরণ□ প্যাকেজিং□ ব্র্যান্ডিং = রপ্তানি। অধিক অর্থনৈতিক মূল্য।

কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রের কাছাকাছি প্রোশেসিং ইউনিট গড়ে তুলে জেলা এবং ব্লকভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশ ঘটানো যেতে পারে।

৬. বর্জ্য থেকে সম্পদ : নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা :

ভারতের বর্জ্য সমস্যা একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হলেও এটিকে অর্থনৈতিক সুযোগে পরিণত করা সম্ভব। জৈব বর্জ্য, কৃষি অবশিষ্টাংশ এবং পৌরবর্জ্য থেকে উৎপাদন করা যেতে পারে : Bioc NG, City Waste Compost, Biomess fuel, Recyeled material, Biobased Product. এর মাধ্যমে এমন একটি 'Circular Economy' গড়ে তোলা সম্ভব যেখানে বর্জ্য হয়ে উঠবে সম্পদ। মূলধারণটি হতে পারে : বর্জ্য□ সম্পদ□ পণ্য□ কর্মসংস্থান□ অর্থনৈতিকমূল্য।

৭. Free Trade Agreement-কে ভারতীয় রপ্তানির সুযোগে পরিণত করতে হবে :

শুধুমাত্র 'FTA' স্বাক্ষর করলেই রপ্তানি বাড়বে না, এরজন্য দরকার 'FTA to Exprt Strategy'। ভারতীয় পণ্যের জন্য নতুন নতুন আন্তর্জাতিক বাজার তৈরি করতে হবে।

৮. প্রযুক্তি হতে পারে নতুন যুগের স্বদেশী শক্তি :

এই শতাব্দীর স্বদেশী আন্দোলনকে প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করার সময় এসেছে। ভারতকে দেশীয় প্রযুক্তি উন্নয়নে উৎসাহ দিতে হবে : AI, Biotechnology, Robotics, Semiconductr Defense, Renewable energy, Waste Management, Food Technology, Agricultural Technology ইত্যাদি।

আগে উল্লিখিত ৮টি পদক্ষেপ ছাড়াও আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এগুলি হলো :

৯. আমদানি প্রতিস্থাপন বা হ্রাস হতে হবে কৌশলগত। ১০. 'ভোকাল ফর লোকাল' থেকে 'লোকাল টু গ্লোবাল' যাত্রা। ১১. কর্মসংস্থানকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রে রাখতে হবে। ১২. জেলাগুলিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। ১৩. সরকারকে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য একটি শক্তিশালী Ecosystem গড়ে তুলতে হবে। ১৪. উপভোক্তাদের 'স্বদেশী অর্থনীতি' প্রমোশানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

আমরা যদি স্বদেশী অর্থনীতিকে অবলম্বন করে সঠিক দিশাতে চলতে পারি তাহলে ভারত ২০৪৭ সালে 'বিকশিত ভারত' (Developed Bharat)-তে পরিণত হবেই।□

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

চলমান জনগণনা এবং সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে সচেতনতা

চর্চাকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হলে ভাষাটির উন্নয়নে সরকার কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিতে পারবে। ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থ-সম্ভার, যেমন বেদ, পুরাণ প্রকাশে সরকারি সাহায্যের অনুমোদন পাওয়া যাবে, প্রকাশের জন্য অর্থরাশিও বৃদ্ধি পাবে। সে-ক্ষেত্রে এই ভাষার জাতীয় গুরুত্ব হারাতে বসেও কিছুটা পুনরুদ্ধার করা যাবে।

ডঃ শ্যামলচন্দ্র দাস

একটি দেশের দীর্ঘকালের ঐতিহ্য, ইতিহাসের ভিত্তি হিসেবে যে ভাষাকে স্বীকার করতে হয়, একাধিক ভারতীয় ভাষার উৎসমুখ হিসেবে যে ভাষার ঋণ আজও অস্বীকার করা যায় না, অথচ যে ভাষাটি ভারতীয় পর্যাপ্ত মাতৃভাষীর অভাবে মৃতপ্রায় তথা ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ হতে বসেছে, সে ভাষা নিয়ে আমাদের মতো মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব অতিক্রান্ত হিন্দু সনাতনীদের গুরুত্ব দিয়ে ভাবা একান্ত কর্তব্য। নইলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ প্রণেতা পাণিনির চর্চাকৃত ভাষা, স্বামী বিবেকানন্দ সমর্থিত ভারতীয় ঐতিহ্য ও ঐক্যের ভাষা তার মূল্য হারাতে হারাতে ক্রমশ বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছে যেতে পারে।

অথচ ভারতীয় হিন্দু সমাজের অধিকাংশ লোকজন ধর্মানুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ এবং বিয়ে বা শ্রাদ্ধের মতো সংস্কারগুলোতে সংস্কৃত ভাষার মন্ত্রাদি আজও ব্যবহার করে থাকি। তাছাড়া 'কাকস্য পরিবেদনা', 'যৎপরনাস্তি'র মতো সংস্কৃত শব্দ প্রাত্যহিক কথাবার্তায় ব্যবহার করে থাকেন শিক্ষিত বাঙ্গালি। রেগে গেলে বাপের বাপ 'তস্য বাপ' তুলে গালাগালিও করতে শোনা যায়। রাঢ়বঙ্গের গ্রামের শিশুদের বলতে শোনা যায় 'ওঁ বিষ্টং নমস্ততে..... পূজ্যা করিং' ইত্যাদি। গ্রামীণ সমাজে মজা-মশকরাও করা হয় 'তিন জামাই ও শশুরের সংস্কৃত জ্ঞান' প্রসঙ্গে। ছোটো জামাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় আগেই শ্বশুরবাড়ির খাটের তলায় এসে লুকিয়ে পড়ে এবং দুই জামাই ও শ্বশুরের সংস্কৃত আলোচনা শুনতে থাকে। তাদের সংস্কৃত ভাষার ধরন-গড়ন বুঝে নিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে বলতে শুরু করে— 'অনুস্বরং বিসর্গং দিলেই যদি সংস্কৃতং হং, ছোটঃ জামাই কেনঃ তাহলে খাটের তলায় রং?' বাঙ্গালি সমাজে এই ধরনের সংস্কৃত ভাষাকেন্দ্রিক নানা বিষয় ছড়িয়ে রয়েছে। শুধু বাঙ্গালি কেন, ভারতীয় হিন্দু সমাজেও এই ধরনের সংস্কৃতভাষা-কেন্দ্রিক নানা বিষয় ও তথ্য ক্ষেত্রসমীক্ষা সম্পন্ন করলে পাওয়া যেতে পারে।

অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা এখনও নানাভাবে ভারতীয় সনাতনী সমাজে জীবিত রয়েছে। বহুল প্রচারের চেষ্টায় সংস্কৃতভারতীর মতো

সংগঠন তৎপর রয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কাল বাদ দিয়েও বলা যায়, নতুন করে সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্দে মাতরম্ বীজমন্ত্রটি দেড়শো বছর পরে আবারও ভারতীয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উপনীত হয়েছে, তা সে রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, ইতিহাস, স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদি নানা দিক থেকে এই জাতীয় গানটি পর্যালোচিত ও মূল্যায়িত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বদান্যতায় এই গান এখন নানা মাত্রিক বৈচারিক বাচন সৃজনে ভূমিকা নিতে শুরু করেছে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রেও।

সংবিধানে এই ভাষা দুইভাবে তালিকাভুক্ত রয়েছে— ধ্রুপদী ও অষ্টম তফশিল স্বীকৃত ভাষা হিসেবে। ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফশিলে ১৯৫০-এর পর থেকে চোদ্দটি ভাষার মধ্যে একটি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত ২২টি প্রধান ভাষার অন্যতম হলো সংস্কৃত, যা একে যথেষ্ট সরকারি মর্যাদাও দিয়েছে। বলাবাহুল্য যে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তরের স্কুল শিক্ষায় সংস্কৃতের পঠনপাঠন অনেকটাই বেড়েছে। তবে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র জন্য উচ্চশিক্ষায় সংস্কৃতের গুরুত্ব আরও বাড়তে শুরু করেছে এবং পরবর্তীতে আরও ক্রমবর্ধমান হবে, তা প্রত্যাশিত।

অবশ্য এই ভাষার ধ্রুপদী স্বীকৃতি এই ধরনের চাহিদা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হতে পারে। বস্তুত তামিলভাষার পরে পরেই সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় প্রেক্ষাপটে পায় ধ্রুপদী স্বীকৃতি (২০০৫ সালে)। এই ভাষা ও সাহিত্য পঠনপাঠনের জন্য ২০২০ সালে সংসদীয় আইনের মাধ্যমে তিনটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে--- নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী জাতীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় এবং তিরুপতি জাতীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়। কেন্দ্রীয় উদ্যোগে না হলেও অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪)-কে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় (২০১৬) হিসেবে সম্প্রতি উত্তরণ ঘটানো হয়েছে। এভাবে দেখলে সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিতে সংস্কৃত ভাষা আজও গুরুত্ব হারায়নি, অন্তত ভারতীয় প্রেক্ষাপটে।

তাছাড়া কথ্য ভাষা হিসেবে এর গুরুত্ব রয়েছে। দক্ষিণ ভারত বা উত্তর-মধ্য ভারতের কিছু জনপদে কথ্যভাষা হিসেবে আজও কথিত হয়ে থাকে। যেমন, কর্ণাটকের মাত্তুর, হোসাহাল্লী গ্রামের মতো কিছু জায়গায় মানুষের দৈনন্দিন কথ্যভাষা হিসেবে সংস্কৃতের ব্যবহার দেখা যায়। মধ্যপ্রদেশের ঝিরি, মোহাদ ও বাঘুওয়ার গ্রামে মানুষ দৈনন্দিন কথ্য হিসেবে সংস্কৃত ব্যবহার করেন আজও। যারা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পরবর্তী উচ্চশিক্ষা করে থাকেন তারা সংস্কৃতকে কথ্যভাষা হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন,অন্তত শিক্ষাঙ্গনে। এইভাবে তথ্য যাচাই করলে বলা যায়, বিগত ১৫ বছর আগে ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে ২৪, ৮২১ জন সংস্কৃতভাষী 'সংস্কৃত ভাষা'কে তাঁদের মাতৃভাষা তথা প্রথম ভাষা হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন, যা ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ০.০০২ শতাংশ।

আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক যে, 'বিশ্বস্য বৃত্তান্তঃ' ও 'সুধর্মা' নামক দু'টি দৈনিক সংস্কৃত সংবাদপত্র নিয়মিত প্রকাশিত হয় কর্ণাটক রাজ্যের মহীশূর থেকে। সুধর্মা আজও প্রকাশিত হয় ১৪ জুলাই, ১৯৭০ থেকে কে এন বরদরাজ আয়েঙ্গারের উদ্যোগে। দিল্লির সেন্ট্রাল সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত একটি মর্যাদাপূর্ণ দ্বিবার্ষিক গবেষণা জার্নাল হলো 'সংস্কৃত বিমর্শ' (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 'বিমর্শ' নামক টোলি রয়েছে)। সাহিত্য আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক সংস্কৃত গবেষণা পত্রিকা 'সংস্কৃত প্রতিভা'। এতদ্‌সত্ত্বেও, সাধারণ ভারতীয় হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত অনুসারে বলা যায়, সংস্কৃত ভাষা আজকে একটি 'মৃতপ্রায়' ভাষা। কেননা, মাতৃভাষী সংখ্যার বিচারে সংস্কৃতর অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, মুমূর্ষুই বটে। এবং সংস্কৃতভাষীর সংখ্যা ক্রমশ কমছে। ফলে দায় বাড়ছে শিক্ষিত হিন্দু সনাতনীদের।

এই ভাষাকে বাঁচানোর ব্যাপারে শিক্ষিত হিন্দু সনাতনীদের একটা দায় ও দায়িত্ব থেকে যায়। সে দায় হলো অবগত ভাষা হিসেবে সংস্কৃত ভাষাকে চলমান জনগণনার আন্তর্জালিক স্ব-গণনা ফর্মে উল্লেখ করা। বিশেষ করে ইংরেজি, হিন্দি, বাংলার সঙ্গে 'সংস্কৃতও জানি' বলে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ আমরা অনেকেই অষ্টম শ্রেণীতে সংস্কৃত পড়েছি। তাছাড়া দৈনিক পূজা, অনুষ্ঠানে সংস্কৃত মন্ত্র বলতে ও শুনতে হয়, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা প্রতিদিন শাখায় সংস্কৃত সুভাষিতম্ বলে থাকেন। জানা ভাষাগুলোর মধ্যে শিক্ষিত বাঙ্গালি 'হিন্দি ভাষা' যেমন জানেন বা দেবনাগরী লিপি লিখতে-পড়তে পারেন, তেমনি সংস্কৃতও কিঞ্চিৎ পারেন। তবে অনর্গল বলতে বা লিখতে সড়গড় হতেই হবে, এমন মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি। আরও একটি কথা বলা আবশ্যক যে, অনলাইন বা পরবর্তীতে সংশোধিত ফর্মে উল্লেখ করলেই আপনাকে পরীক্ষা দিতে হবে না বা যাচাই করবার জন্য কেউ আপনার পিছনে উঠে-পড়ে লেগে পড়বে না। আপনি শিক্ষিত বাঙ্গালি হলে, সংস্কৃত অল্পস্বল্প জানলে, ভাষা জানার তালিকায় এটিকে লিপিবদ্ধ করুন। তাহলে ভাষা- চর্চাকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হলে ভাষাটির উন্নয়নে সরকার কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিতে পারবে। ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থ-সম্ভার, যেমন বেদ, পুরাণ প্রকাশে সরকারি সাহায্যের অনুমোদন পাওয়া যাবে, প্রকাশের জন্য অর্থরাশিও বৃদ্ধি পাবে। সে-ক্ষেত্রে এই ভাষার জাতীয় গুরুত্ব হারাতে বসেও কিছুটা পুনরুদ্ধার করা যাবে।

আসুন, আমরা সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে সকলে একটু সচেতন হই!

(লেখক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

শতবর্ষ উত্তীর্ণ কংগ্রেস কেন দেশ থেকে মুছে যাচ্ছে

দেশ ও হিন্দু বিরোধী আচরণে কংগ্রেস দলটি মুছে যেতে চলেছে। তার অন্যতম কারণ। একবার দুবার নয়, বার বার তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে এই ধরনের ভুলগুলো করে এসেছে। আজও দেশে নির্দিষ্ট রাষ্ট্রভাষা নিয়ে ঐকমত্য তৈরি হয়নি। রয়েছে চাপা অসন্তোষ। এটা হতো না যদি সেদিন জওহরলাল নেহরু ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের কথা শুনে সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা মেনে নিতেন। না, নেহরু তা কর্ণপাত করেননি। সেদিনের তার পাপ আজ আমরা বহন করে চলেছি। জাতীয় পতাকা কি হবে দেশের সনাতনী সাংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গেরুয়া কাপড়ের উপর 'বন্দে মাতরম' লেখা পতাকা, সেটাও নাকচ করে দেন নেহরু। তখন তার কথা চলতো। দেশের অধিকাংশ সাংসদ ও বিধায়করা তার অনুগামী ছিল। পরবর্তীকালে বর্তমান জাতীয় পতাকাটিকে গ্রহণ করা হয়। তোষণনীতির কারণে কংগ্রেস গেরুয়া বিরোধী।

জওহরলাল নেহরু সংবিধানে ৩৫এ মাধ্যমে হিন্দুদের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেন। সংবিধানে ৩৭০ ধারা জারি করে কাশ্মীরে হিন্দু নরসংহার ঘটানোর ব্যবস্থা করেন। হাজার হাজার হিন্দুর রক্তে লাল হয়ে যায় কাশ্মীর উপত্যকা। লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাড়ি ঘর ছেড়ে কাশ্মীর থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। যেসব কাশ্মীরি মুসলমান ছিল হিন্দু প্রতিবেশী, সুযোগ বুঝে তারাও অচেনা হয়ে যায়। ইংরেজের তৈরি পুলিশি আইন, প্রশাসনিক আইনের পরিবর্তনের চেষ্টাও করেনি কংগ্রেস। রেখে দিয়েছিল ব্রিটিশের শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা। সংস্কার করেনি ব্রিটিশ কর ব্যবস্থা ও বাণিজ্য ব্যবস্থার। ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজের তৈরি ইতিহাস পড়ানো হয়। তাদের জানতে দেওয়া হয়নি ভারতের অতীত গৌরবের ইতিহাস।

জহওরলাল নেহরু শুধু নিজের নাম কীভাবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে তার ব্যবস্থা করেন। ইউএনও-তে ভারতের স্থায়ী আসন লাভের সম্ভাবনা থাকলেও তা চীনকে দান করে দেন। শুধু তাই নয়। চীনকে জমি দিয়ে বন্ধুত্ব তৈরি করার চেষ্টা করেন। নেহরু শুধু চীনকেই জমি দেয়নি, জমি দিয়েছে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও বর্মাকে। এমনভাবে জমি দান খয়রাতি করেছেন তা দেখে মনে হয় দেশটা তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি।

দেশের নামকেও শুধু 'ভারতবর্ষ' রাখতে দেননি। তারই আদেশে সংবিধানে লেখা হয়, India, that is Bharat. হাজার হাজার বছর ধরে স্বমহিমায় উজ্জ্বল যে নাম তাও সহ্য হয়নি কংগ্রেসের। ১৯৮০ সালে সংবিধানের মূল ভিত্তি, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির পরিবর্তন করে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি সংসদের অধিবেশন না ডেকেই, ঢুকিয়ে দেন ইন্দিরা গান্ধী। বলতে পারেন, এ কেমন গণতন্ত্র?

১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর কংগ্রেস সহানুভূতির হওয়ায় সংসদে ৪০৪টি আসন লাভ করে। সেই বলেই ১৯৮৫ সালে সংবিধানের নাগরিকত্ব অধ্যায়ে ৬ নম্বর ধারা যুক্ত করার ফলে অসমে ৫০ লক্ষ বাংলাদেশি ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করে। এই ভাবে কংগ্রেস ধারাবাহিক ভাবে হিন্দু সমাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে। বিভিন্ন জাতপাতের মাধ্যমে হিন্দু সমাজকে টুকরো টুকরো করে এসেছে। তাইতো আজ অতি সহজেই রাহুল গান্ধী টুকরে টুকরে গ্যাঙের সমর্থক হতে পেরেছে। ওরা দেশ ও হিন্দু সমাজকে যত ক্ষতি করার চেষ্টা করবে ততই শতাব্দী উত্তীর্ণ কংগ্রেস পিছনে চলে যাবে। এটাই দেশের সঙ্গে বেইমানি করার ফল। এটাই ভবিতব্য।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

আমি এখনো স্বাধীনতা খুঁজে বেড়াই

হাজার বছর পর আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। স্বাধীনতার অর্থ বুঝতে আমাদের আরও হাজার বছর লাগবে। দেশভাগের শর্তে স্বাধীনতা লাভ। দয়া ভিক্ষা করে স্বাধীনতা। তাই শুরুতেই স্বাধীনতার মধ্যে ছিল পরাধীনতার গ্লানি। মৃতদেহের ওপর দিয়ে দেশভাগ— কী করুণ অধ্যায়! স্বাধীনতার স্বপ্ন অচিরে দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। দেশহারাদের স্বাধীনতা, উদ্বাস্তুদের স্বাধীনতা কেমন হবে? যে স্বাধীনতার জন্য লক্ষ মানুষ রক্ত দিল, ঘর ছাড়ল, প্রিয়জন হারাল— সেই স্বাধীনতাকে আমরা বানিয়েছি স্বার্থের হাতিয়ার। স্বাধীনতা মানে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, স্বাধীনতা মানে আন্দোলনের নামে পাথর ছোঁড়া, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করা, দেশ বিরোধিতা করা, মানুষ হত্যা করা। স্বাধীনতা মানে ভিআইপি কালচার, নেতা-নেত্রীদের দম্ভ, অহংকার, ক্ষমতা ভোগ, সরকারি সম্পত্তি লুট করা। স্বার্থপর, নিষ্ঠুর পৃথিবী তৈরি করা, মনুষ্যত্বের অবমূল্যায়ন করা। আমরা পতাকা তুলি, গান গাই, ভাষণ দিই— কিন্তু পাশের মানুষটা দু'বেলা খেতে পায় কিনা খোঁজ রাখি না।

রক্ত দিয়ে কেনা স্বাধীনতা আজ ফাইলে বন্দি, সংবিধান আছে, গণতন্ত্র আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে নৈরাজ্য, অস্থিরতা। আলোচনা, সমালোচনা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ, ব্যক্তি আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ, নেতা-নেত্রীদের ঘনঘন দলবদল— এরই নাম গণতন্ত্র! স্বাধীনতা এখন শুধু ভোটের রাজনীতি। আমরা নিজেরাই নিজেদের শৃঙ্খল পরেছি স্বাধীনতার নামে। স্বাধীনতা পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু স্বাধীন হয়ে বাঁচতে শিখিনি। যতদিন না আমরা মানুষকে মানুষ ভাবব, দেশকে মা না ভাবার ততদিন এই স্বাধীনতা শুধুই কাগজের স্বাধীনতা হয়ে থাকবে। স্বাধীনতা এখন ভার্চুয়াল, স্বাধীনতা মঞ্চ গরম গরম বক্তৃতা। তারপর শুধু শূন্য। তাই স্বাধীনতার ইতিহাস যত বড়ো হয় জনগণের বঞ্চনার ইতিহাস তত বাড়ে। স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষ উপলক্ষ্যে কবি নজরুল ইসলামের ভাষায় বলি— 'কচি খোকা চায় নাকো স্বরাজ/চায় দুটো ভাত একটু নুন।' আমি বলি— বেকারত্ব চায় নাকো স্বাধীনতা/চায় একটা কাজ— দুমুঠো ভাত। আমি এখনো স্বাধীনতা খুঁজে বেড়াই।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

ফঃ ৩

বাজপেয়ীর সতর্কবার্তা আজও প্রাসঙ্গিক

অটল বিহারী বাজপেয়ীর নামে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি বার্তা আজ নতুন করে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক মহলে আলোচনার জন্ম দিয়েছে— 'বিজেপির সঙ্গে লড়াই করুন, কিন্তু বিএমএস-এর সঙ্গে লড়াই করবেন না।' এই উক্তিটির প্রামাণ্য উৎস নিশ্চিত নয়। তাই এটিকে বাজপেয়ীর প্রমাণিত বক্তব্য হিসেবে দাবি করা যায় না। কিন্তু বক্তব্যটির মধ্যেকার সতর্কতার সুর আজকের বাস্তবতার সঙ্গে মিলে যাওয়ায় প্রশ্নটি নতুন করে সামনে এসেছে। অভিযোগ উঠছে, ভারতীয় জনতা পার্টিরই বেশ কিছু জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছেন। বিষয়টি কি শুধুই ব্যক্তিগত বিরোধ? নাকি এর পিছনে রয়েছে সাংগঠনিক স্বার্থের সংঘাত? নাকি রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে শ্রমিক সংগঠনের স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা জরুরি। বিএমএস কোনো রাজনৈতিক দলের শাখা নয়। শ্রমিকদের দাবি, অধিকার, কর্মসংস্থান, মজুরি এবং সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোই একটি শ্রমিক সংগঠনের যথাযথ ভূমিকা। তাই কোনো সরকারের নীতি কিংবা কোনো জনপ্রতিনিধির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলেই তাকে রাজনৈতিক শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না।

গঠনমূলক বিরোধিতা গণতন্ত্রের অঙ্গে। কিন্তু মতবিরোধকে শত্রুতায় পরিণত করা গণতন্ত্রের ধ্বংস সাধন। আজ যদি বিজেপির কোনো জনপ্রতিনিধি বিএমএস-এর কোনো দাবির বিরোধিতা করেন, তাঁর যুক্তি দেওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে— কিন্তু যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে শ্রমিক সংগঠনের উপর চাপ সৃষ্টি, সংগঠনের কাজে হস্তক্ষেপ কিংবা শ্রমিক নেতৃত্বকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেন, তাহলে বিষয়টি আর ব্যক্তিগত থাকে না— তখন সেটি হয়ে ওঠে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক বিষয়।

বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে তাই প্রশ্নটা সরাসরি করা যায়— বিএমএস কি বিজেপির প্রতিপক্ষ? যদি না হয়, তাহলে বিজেপিরই কিছু জনপ্রতিনিধি কেন তাদের সঙ্গে সংঘাতের পথে যাচ্ছেন? আর যদি কোথাও বিএমএস-এর নাম ব্যবহার করে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করেন, সেখানেও তদন্ত হোক। কেউই দলীয় পরিচয় কিংবা শ্রমিক সংগঠনের পরিচয়ের আড়ালে অন্যায় করার অধিকার রাখেন না। কিন্তু কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধকে যদি গোটা বিএমএস-এর সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘাতে পরিণত করার চেষ্টা করেন, তাহলে সেটি হবে আরও বড়ো ভুল। কারণ রাজনীতির ময়দানে আজ যে জনপ্রতিনিধি ক্ষমতায়, আগামীকাল তিনি নাও থাকতে পারেন। কিন্তু শ্রমিক থাকবে, শ্রমিকদের সমস্যা থাকবে, শ্রমিকদের সংগঠনও থাকবে।

অটল বিহারী বাজপেয়ীর নামে প্রচারিত সতর্কবার্তাটি প্রামাণ্য কি না, তা গবেষণার বিষয়। কিন্তু সতর্কবার্তার রাজনৈতিক শিক্ষা আজও প্রাসঙ্গিক হতে পারে— সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হলে সংঘাত নয়, সংলাপ দরকার। বিজেপির জনপ্রতিনিধিদেরও মনে রাখতে হবে, জনপ্রতিনিধিত্ব কোনো ব্যক্তিগত ক্ষমতার লাইসেন্স নয়। মানুষের ভোটে নির্বাচিত হওয়া মানে মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব নেওয়া। শ্রমিকদের কোনো ন্যায্য প্রশ্ন উঠলে তার উত্তর দিতে হবে যুক্তি দিয়ে, রাজনৈতিক প্রভাব দিয়ে নয়। সময় এসেছে মুখোমুখি বসার। যেখানে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে আলোচনার টেবিল হোক। যেখানে অভিযোগ আছে, সেখানে তদন্ত হোক। যেখানে অন্যায় আছে, সেখানে ব্যবস্থা হোক।

কিন্তু অকারণে শ্রমিক সংগঠনকে শত্রু বানানোর রাজনীতি বন্ধ হোক। কারণ শেষপর্যন্ত প্রশ্নটি অত্যন্ত সহজ— 'শ্রমিকের পাশে দাঁড়ানোর রাজনীতি যদি বিজেপির শক্তি হয়, তাহলে সেই শ্রমিকের সংগঠনের সঙ্গেই সংঘাত কেন?' বাজপেয়ীর নামে ছড়িয়ে পড়া কথাটি সত্যিই তাঁর কি না, তার চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছে আজকের প্রশ্নটি— বিজেপি কি তার শ্রমিকভিত্তিক বৃহত্তর পরিসরকে আরও শক্তিশালী করবে, নাকি নিজেদের মধ্যেকার সংঘাতেই সেই শক্তিকে ক্ষয় করে সময় নষ্ট করবে? সময় থাকতে উত্তর খুঁজে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হারানো যায় নির্বাচনে; কিন্তু নিজেদের সাংগঠনিক ভিত দুর্বল হয়ে গেলে সেই ক্ষতি পূরণ করা অনেক কঠিন।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
কলেজরোড, খয়রামারী বনগাঁ উঃ ২৪ পরগনা।

প্রসঙ্গ বন্দে মাতরম্

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কালজয়ী রচনা বন্দে মাতরম্‌কে খণ্ডিত করে কংগ্রেস যে পাপ করেছিল, বর্তমান কেন্দ্র সরকার তা মোচন করে সেই মহামন্ত্রকে পূর্ণ মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সংসদে আইন করে পূর্ণ বন্দে মাতরম্ গায়নের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে গায়নবিধির সাতটি নিয়মও তৈরি করা হয়েছে। এটাই এতদিন প্রকৃত রাষ্ট্রভক্ত মানুষের চাহিদা ছিল। সেই চাহিদাও পূরণ হয়েছে।

কিন্তু একটি প্রশ্ন উঠে আসছে যে, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক যেভাবে বন্দে মাতরম্ রচনা করেছিলেন, সেই ভাবেই তার গায়নবিধি ঠিক করা হলো না কেন? বরং তাকে বিকৃত করে গায়ন চলছে। কেন্দ্র সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক গায়নবিধি সারা দেশে যে রেকর্ডিং পাঠিয়েছে তাতে 'সপ্তকোটি'র স্থানে 'কোটি কোটি' শব্দ রয়েছে। কিন্তু মারাত্মকভাবে যে ভুল করা হয়েছে তা হলো, 'অবলা কেন মা এত বলে'-র স্থলে 'কে বলে মা তুমি অবলে' গাওয়া হচ্ছে। এটি বঙ্কিমচন্দ্র ও রাষ্ট্রগীতের প্রতি কোনো ভাবেই শ্রদ্ধা প্রকাশ নয়। স্বস্তিকা পত্রিকায় এই পত্রের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—**ভরত চন্দ্র কুণ্ডু,**
৩এ, রাজেন্দ্র সেন লেন, কলকাতা-৬।

রাখিবন্ধন
নারী শক্তি উদ্‌যাপন

ডঃ পিয়া সিনহা

প্রতি বছর শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হয় পবিত্র রাখিবন্ধন অনুষ্ঠান। তবে, এখন আমরা রাখিবন্ধন বলতে ভাই ও বোনের সম্প্রীতির যে উৎসব পালন করে আসছি, প্রথমে অবশ্য এটি তেমন ছিল না— বরং ছিল স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পালনীয় প্রথা। রাখিবন্ধন উৎসবের আলোচনার প্রসঙ্গে ভবিষ্যপুরাণের একটি গল্পের কথা উল্লেখযোগ্য, যেখানে একবার অসুর বধের উদ্দেশ্যে দেবরাজ ইন্দ্র যখন যুদ্ধে লিপ্ত হতে চলেছেন, তখন ইন্দ্রাণী শচীদেবী ইন্দ্রের সুরক্ষা নিয়ে অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ইন্দ্রাণী শচী তাঁর সাধনার পূর্ণ শক্তি একত্রিত করে এক বিশেষ রক্ষাসূত্র দেবরাজ ইন্দ্রের হাতে বেঁধে দেন। সেদিনও ছিল শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা। যুদ্ধে সুরদের পরাজিত করে দেবরাজ ইন্দ্র জয়ী হন।

পুরাণ অনুসারে দেবী লক্ষ্মী একটি রাখি নিয়ে মহারাজ বলীর কাছে গিয়েছিলেন। মহারাজ বলীর বিনীত অনুরোধে ভগবান বিষ্ণু পাতাললোকে থাকতে রাজি হওয়ায় দেবী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। মহারাজ বলীকে দেবী রাখিবন্ধনে আবদ্ধ করার পর যখন বলী তাঁর বোনকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কী প্রত্যাশা করেন, তখন দেবী শ্রীবিষ্ণুকে বৈকুণ্ঠে ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করেন। পুরাণে দেখা যায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে দেবী কুন্তী তাঁর পৌত্র অভিমন্যুর হাতে রাখি পরিয়েছিলেন তার সুরক্ষা স্বরূপ। আবার, যখন কংস ও তার অনুচরেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বারবার আক্রমণ করছিল, তখন মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার্থে তাঁর হাতে পবিত্র সুতোর বন্ধন দিয়েছিলেন। আবার দেখি শিশুপালকে হত্যার উদ্দেশ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করেন, সেই সময় চক্রের ঘর্ষণে তাঁর নিজের আঙুল কেটে যায়। রক্তক্ষয় রোধের উদ্দেশ্যে দ্রৌপদী নিজের শাড়ি ছিঁড়ে শ্রীকৃষ্ণের হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন। পরে সেই শ্রীকৃষ্ণই দ্রৌপদীকে বস্ত্রহরণের লজ্জা থেকে রক্ষা করেছিলেন।

দেখা যাচ্ছে রাখিবন্ধন আসলে নারীর 'সংকল্প শক্তি'। অর্থাৎ একজন নারীর দৃঢ়তা ও ইচ্ছা শক্তির প্রতীক, যা দিয়ে বিভিন্ন সময় নারী তার বিভিন্ন সম্পর্ক— কখনো স্বামী, কখনো ভাই, কখনো তার শুভাকাঙ্ক্ষীকে রক্ষা করার সংকল্প নিয়েছে। প্রাচীনকালে, 'অক্ষত' চাল পাকিয়ে একটি লম্বাটে আকৃতির কাপড় তৈরি করা হতো, যা মঙ্গল কামনার্থে হাতে বাঁধা হতো— একে বলা হতো 'রক্ষাই'। এ বন্ধন পবিত্র ভালোবাসা, পারস্পরিক বিশ্বাস ও সুরক্ষার প্রতীক ও সাক্ষী। সংস্কৃত শব্দ 'রক্ষা' মানে সুরক্ষা এবং 'বন্ধন' মানে বাঁধার সুতো। এই দিনে বোনেরা ভাইয়ের হাতে পবিত্র সুতো বেঁধে তার দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা করে এবং ভাইরা আজীবন বোনকে রক্ষা করার শপথ নেয়। সঠিক বিচারে এ সম্মান-সুরক্ষার দায়িত্ব উভয়ের। এই উৎসব শুধু রক্তসম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বন্ধু, প্রতিবেশী বা যেকোনো কাছের মানুষের হাতে রাখি বেঁধে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করা যায়। এই উৎসবের মধ্যে দিয়েই ধর্ম, বর্ণ বা জাতিগত ভেদাভেদ ভুলে মানুষ একে অপরের কাছাকাছি আসে। যেমন, বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু ও মুসলমান ভাইদের মধ্যে ঐক্যের প্রতীক হিসেবে রাখিবন্ধন উৎসবের সূচনা করেছিলেন।

বর্তমানে এর পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে, আয়োজন ও বৃহৎ থেকে বৃহত্তর রয়েছে, রাখির মধ্যেও বৈচিত্র্য উঁকি দিচ্ছে। তবু, নারী জীবনে এ উৎসবের চিরাচরিত সনাতনী মাহাত্ম্য আজও অটুট। অর্থাৎ, রাখিবন্ধন আজ একটা পবিত্র সামাজিক অনুষ্ঠান হলেও, এটি প্রকৃত পক্ষে নারী শক্তিরই উদ্‌যাপন। এই বন্ধনের মধ্যে দিয়েই নারীর মধ্যে যে মাতৃশক্তি, যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা তা জাগ্রত হয়। এই শক্তি বলেই নারী পরিণত হয় এক রক্ষকে, যিনি পরম স্নেহ, মায়া, মমতায় তার ভালোবাসার মানুষকে আগলে রাখেন। ▫

দীর্ঘদিন ধরে কাশি ফুসফুসের টিবি বা ক্যানসার হতে পারে

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

ফুসফুসের টিবি ও ফুসফুস ক্যানসারের মধ্যে সাধারণ একটি উপসর্গ হলো দীর্ঘমেয়াদি কাশি। এছাড়াও রোগ দু'টির অনেক উপসর্গে মিল রয়েছে। যেমন জ্বর, কাশি, কাশির সঙ্গে কফ এবং মাঝে মাঝে কফের সঙ্গে রক্ত বের হওয়া, ওজন কমে যাওয়া, বুকে ব্যথা, দুর্বলতা ও ক্ষুধামান্দ্য দেখা যায় রোগীদের মধ্যে।

বক্ষব্যাধি সার্জারি বিশেষজ্ঞরা বলেন, টিবি রোগ ও ফুসফুস ক্যানসারের উপসর্গ প্রায় একই হওয়ায় রোগীদের পাশাপাশি চিকিৎসকরাও মাঝে মাঝে ভুল করে থাকেন। যার কারণে আক্রান্ত রোগীর রোগকে টিবি রোগ মনে করে চিকিৎসা করে থাকেন।

ক্যানসার বিশেষজ্ঞদের মতে, ফুসফুসের টিবি ও ক্যানসারের মধ্যে পার্থক্য করা হয় মূলত কাশির ধরন ও কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করে। যেমন টিবি রোগীদের কাশি শুরু হয় মূলত বিকাল থেকে। সঙ্গে জ্বর থাকলেও সেটি নেমে যাবে। আর ফুসফুস ক্যানসার নির্ণয়ের জন্য এফএনএসি পরীক্ষা করা হয় আর ফুসফুসে টিবি রোগের জন্য এএফবি পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এছাড়া বেশকিছু পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে রোগ দুটি শনাক্ত করা হয়।

ফুসফুস ক্যানসার নির্মূলে প্রথমে রোগটি শনাক্ত করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ ক্যানসারের কোনো নির্দিষ্ট উপসর্গ দেখা দেয় না। যখন রোগটি চরম পর্যায়ে পৌঁছায় তখন কিছু উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন ক্রমাগত কাশি, শ্বাসকষ্ট, রক্ত-সহ কফ বের হওয়া, বুকে ব্যথা, শরীরের ওজন কমে যাওয়া কিংবা কণ্ঠস্বর বসে যাওয়া। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ক্যানসার নির্দেশ করে তাহলে চূড়ান্তভাবে নির্ণয়ের জন্য তাদের পিইটি-সিটি স্ক্যান এবং সিটি বা ব্রঙ্কোস্কোপি গাইডেড টুকাট বায়োপসি করাতে হয়। রোগটি নির্ণয় হওয়ার পর চিকিৎসা শুরু করতে হবে রোগীদের।

সাধারণত ক্যানসারের চারটি পর্যায় থাকে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়। আর চারটি পদ্ধতিতে ফুসফুস ক্যানসারের

চিকিৎসা হয়ে থাকে। সার্জারি, কেমোথেরাপি, রেডিয়োথেরাপি ও টার্গেটেড থেরাপি। ক্যানসার রোগ বিশেষজ্ঞরা বলেন, রোগীর শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয় ধাপে সার্জারি করার সুযোগ রয়েছে। টিউমারটি যদি ছোটো থাকে সার্জারিই সবচেয়ে ভালো।

দ্বিতীয় ধাপে সার্জারি না করা গেলে অনেককে কেমোথেরাপি দেওয়া হয়। তাছাড়া তৃতীয় ধাপে ক্যানসারটি অনেক অগ্রসর হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কেমোথেরাপি বা রেডিয়োথেরাপি অথবা টার্গেটেড থেরাপি দিয়ে চিকিৎসা করা হয় তাদের।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন, রোগীর অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি রোগ বা বয়স বেশি হলে কেমো বা অন্যান্য থেরাপি দিতে হয়। এছাড়া কারও যদি চতুর্থ পর্যায়ে গিয়ে রোগটি ধরা পড়ে তাহলে তাকে কেমো, রেডিয়ো অথবা টার্গেটেড থেরাপির চিকিৎসা দিতে হয়। তবে রোগীর জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে চিকিৎসা করাই উত্তম হিসেবে মনে করেন তাঁরা।

ফুসফুস ক্যানসারের রোগীদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে হলে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্ত করতে হবে। যদিও সব দেশে ক্যানসার শনাক্তকরণের সুবিধা নেই। তবে যেসব এলাকায় ধূমপানের প্রবণতা বেশি সেসব এলাকার মানুষদের ক্যানসারের স্ক্রিনিঙের আওতায় আনতে পারলে দেশে ফুসফুস ক্যানসারের রোগীদের মৃত্যুঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব।

বিশ্বে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্যানসারে মারা যায়। গবেষকরা বলছেন, প্রায় অর্ধেকের মতো মৃত্যুর ঝুঁকিই প্রতিরোধযোগ্য। ক্যানসারের প্রধান তিনটি কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন ধূমপান, অতিরিক্ত মদ্যপান ও স্থূলতা।

'দ্য ল্যানসেট' জার্নালে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়, ২০১৯ সালের মোট ক্যানসারের মৃত্যুর ৪৪.৪ শতাংশ অর্থাৎ সাড়ে ৪৪ লক্ষ মৃত্যুর কারণ প্রতিরোধযোগ্য ঝুঁকির কারণে। সেখানে তারা ধূমপান, মদ্যপান বা স্থূলতার সঙ্গে ক্যানসারের ঝুঁকির পরিসংখ্যান তুলে ধরেন।

গবেষকরা ২৩ ধরনের ক্যানসারে মৃত্যু এবং এর সঙ্গে যুক্ত ৩৪ ধরনের ঝুঁকি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসেন। গবেষণাপত্রটি লেখেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের ইনস্টিটিউট ফর হেল্‌থ্ মেট্রিকস্ অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশনের পরিচালক ডঃ ক্রিস্টোফার মুরে ও তাঁর সহকর্মীরা। তিনি জানান, ক্যানসারের জন্য দায়ী ঝুঁকিগুলো উদ্‌ঘাটনে এটা এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বড়ো প্রচেষ্টা।

বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস্ ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত রয়েছে এ গবেষণা। এতে ডঃ মুরে পরিচালিত দ্য ইনস্টিটিউট ফর হেল্‌থ্ মেট্রিক্স অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশনের গ্লোবাল বার্ডেন অব ডিজিজ প্রকল্পের তথ্য ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ ক্যানসার ও ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়।

যথাযথ ফলাফল পেতে গবেষকরা ২০১০ থেকে ২০১৯ সালের ২০৪টি দেশের ক্যানসারে মৃত্যু ও অসুস্থতার তথ্য নিয়ে কাজ করেছেন। তাদের কাজের আওতায় ছিল ২৩ ধরনের ক্যানসার ও ৩৪টি রিস্ক ফ্যাক্টর। সেখানেই ধূমপান, মদ্যপান ও স্থূলতার মতো প্রতিরোধযোগ্য কারণগুলো ওঠে এসেছে। অর্থাৎ জীবনশৈলী ও বিভিন্ন অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে এর ঝুঁকি কমিয়ে আনা যেতে পারে। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসূ। ◻

'লোকতন্ত্র সেনানী-১৯৭৫' সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান

গত ৯ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী 'লোকতন্ত্র সেনানী-১৯৭৫' সম্মান জ্ঞাপন করলেন। রাজ্যের উদ্যোগে এই সম্মাননা প্রদান এবারই প্রথম। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে। সেই সময় বাক্‌স্বাধীনতা হরণ, নাগরিক স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা, সংবাদমাধ্যমের ওপরে নিয়ন্ত্রণ, বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার, এককথায় কণ্ঠরোধ করে ভারতীয় গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছিল। দীর্ঘ ২১ মাস সমস্ত দেশকে জেলখানায় পরিণত করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। সেইসময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে 'লোক সংঘর্ষ সমিতি' গঠন করে সরকারের দমনপীড়নের বিরুদ্ধে, জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও জনমত গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে গান্ধাবাদী নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। সেই সময় সত্যাগ্রহ করে সারা দেশে যে ১ লক্ষ ৭০ হাজার স্বয়ংসেবক কারাবরণ করেন, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৫ হাজার জন ছিলেন। জেলের মধ্যে অকথ্য অত্যাচারে বহু সত্যাগ্রহী সেই সময় পরলোকগত হন।

বক্তব্য রাখছেন ড: বিজয় আঢ্য

সেই সময় আত্মগোপন করে থাকা সঙ্ঘের প্রচারক ও কার্যকর্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ইন্দিরা বিরোধী 'জনতা পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক জোট

তৈরি হয়। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে সেই জোটের কাছে কংগ্রেস দলের শোচনীয় পরাজয়ের পর সেই কুখ্যাত জরুরি অবস্থার অবসান ঘটে।

জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করা স্বয়ংসেবকরা পরবর্তীকালে 'লোকতন্ত্র সেনানী সঙ্ঘ' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। ২০০৮ সালে মধ্যপ্রদেশ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান প্রথম 'লোকতন্ত্র সেনানী সম্মান নিধি' প্রদান করেন। পরে বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য— মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, গুজরাট, হরিয়াণা, ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, অসম ও ওড়িশা সরকারও লোকতন্ত্র সেনানীদের সম্মান নিধি প্রদান করে।

কয়েক মাস আগে কলকাতার স্থানীয় রথীন্দ্র মঞ্চে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ 'লোকতন্ত্র সেনানী সঙ্ঘ'-এর একটি অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে তিনি সত্যাগ্রহী তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সমিতির আমন্ত্রিত সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী এবং অদ্বৈতচরণ দত্তের মুখে জরুরি অবস্থার সেই ভয়াবহ দিনগুলির

মুখ্যমন্ত্রী সম্মাননা জ্ঞাপন করছেন প্রবীণ প্রচারক জয়দেব সিংহরায়কে।

সম্মাননা জ্ঞাপন মালদার বিদ্রোহী কুমার সরকারকে।

কথা শোনেন এবং সেদিনই ঘোষণা করেন আগামী ৯ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে লোকতন্ত্র সেনানীদের সম্মান জানানো হবে।

সেই অনুসারে এদিন রাজ্যের প্রশাসনিক সদর কার্যালয় নবান্নের সভাঘরে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে 'লোকতন্ত্র সেনানী ১৯৭৫ ঃ সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান'-এর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করে জেলবন্দি ৩২৫ জন লোকতন্ত্র সেনানীকে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, উত্তরীয় পরিয়ে তাম্রপত্র প্রদান করা হয়। বেদ মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। সেই সময় প্রত্যেকের উপর পুষ্পদল বর্ষণ করা হচ্ছিল। মুখ্যমন্ত্রী ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্পণ করে লোকতন্ত্র সেনানীদের উদ্দেশে নমস্কার করেন। তারপরেই বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। রাজ্যের মুখ্য সচিব তাঁর স্বাগত ভাষণে ঘোষণা করেন, লোকতন্ত্র সেনানীদের প্রতিমাসে ১০ হাজার টাকা সাম্মানিক ভাতা, সরকারি বাসে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যাতায়াত এবং সরকারি হাতপাতালে চিকিৎসার জন্য বছরে ১ হাজার টাকা প্রদান করা হবে। কোনো লোকতন্ত্র সেনানী জীবিত না থাকলে তাঁর পরিবারের কোনো সদস্য এই সুবিধা পাবেন।

তাম্রফলক প্রদান করে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন লোকতন্ত্র সেনানী সঙ্ঘের সুনীলপদ গোস্বামী, ডাঃ শম্ভুনাথ ধাড়া, শচীন্দ্রনাথ সিংহ, প্রতাপ ব্যানার্জি, বিদ্যাসাগর মন্ত্রী ও দেবাশিস লাহিড়ীকে। এছাড়াও জেলা প্রতিনিধি হিসেবে বাঁকুড়া জেলার অবনীভূষণ মণ্ডল, মেদিনীপুরের জয়দেব সিংহরায়, কলকাতার রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দার্জিলিঙের লোকরাজ আগরওয়াল, মালদার বিদ্রোহী কুমার সরকার, কলকাতার শিবকুমার বাগলা এবং মেদিনীপুরের মনোরঞ্জন কবির হাতে তাম্রফলক তুলে দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন

সম্মাননা জ্ঞাপন প্রবীণ প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামীকে।

সম্মাননা জ্ঞাপন শিবকুমার বাগলাকে।

সম্মাননা জ্ঞাপন বাঁকুড়ার অবনীভূষণ মণ্ডলকে।

করেন। এরপর লোকতন্ত্র সেনানী তথা স্বস্তিকা পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্যকে জরুরি অবস্থার সেই ভয়াবহ দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনার জন্য আহ্বান জানানো হয়। শ্রীআঢ্য বলেন, ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন আক্ষরিক অর্থেই সারা দেশে গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছিল। তার প্রতিবাদে সেটা ছিল দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম। ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ, সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশিপ, প্রতিবাদকারীদের গ্রেপ্তার, এককথায় দেশকে জেলখানায় পরিণত করা হয়েছিল। এরপর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবন্দি হওয়া লোকতন্ত্র সেনানীদের অবদানের স্বীকৃতি দিতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকেই লোকতন্ত্র সেনানীরা এই সম্মান পেয়েছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি

সম্মাননা জ্ঞাপন দার্জিলিঙের লোকরাজ আগরওয়ালকে।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের উল্লেখ করে বলেন, ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার এবছরই ৫০ বছর পার হয়েছে। ২৫ জুন শুধু এটি একটি রাজনৈতিক ঘটনার অন্ধকার স্মৃতিই নয়, এটি ভয়ঙ্কর এক সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন গণতান্ত্রিক কাঠামো ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, এই দিনটি দেশকে মনে করিয়ে দেয় যে, ভারতীয় সংবিধান ও নাগরিক অধিকার রক্ষায় সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন। জরুরি অবস্থার সময়ে মানুষের বাক্‌স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল। গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী এবং প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। লোকতন্ত্র সেনানীদের নবান্নে উপস্থিতি, যাতায়াত, খাওয়াদাওয়া এবং অন্যান্য ব্যবস্থার দায়িত্ব রাজ্য প্রশাসন প্রতিটি জেলার জেলাশাসকদের ওপর ন্যস্ত করেছিল। এই অনুষ্ঠান লোকতন্ত্র সেনানীদের কাছে একটি আবেগঘন মুহূর্তের দিন ছিল।

উপস্থিত লোকতন্ত্র সেনানীর একাংশ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ত্রিদিবসীয় মাতৃশক্তি বর্গ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে শিলিগুড়ির শ্রীকৃষ্ণ প্রণামী মন্দিরে গত ৬ থেকে ৯ আগস্ট ত্রিদিবসীয় মাতৃশক্তি বর্গ অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ৭২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। বর্গ পরিচালনার জন্য ৫ জন শিক্ষিকা ও ৫ জন প্রবন্ধক উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে বর্গের শুভ সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণ প্রণামী মন্দিরের শ্রীমৎ মোহন গুরুজী আশীর্বচন দান করেন। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সহ-সভাপতি শ্রীমতী বিভা সরকার। উদ্বোধনী ভাষণ রাখেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্রীয় মাতৃশক্তি সংযোজিকা শ্রীমতী ঝরনা জানা। তাঁর ভাষণে সংগঠন, সমাজ ও পরিবারের প্রতি মাতৃশক্তির দায়িত্ব এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মেয়েদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়গুলি উঠে আসে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত মাতৃশক্তি সংযোজিকা শ্রীমতী সোমা দে।

বর্গের দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় দুর্গাবাহিনীর সংযোজিকা প্রজ্ঞাপারমিতা মহলা। তিনি তাঁর ভাষণে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা করেন। ৭ আগস্ট বর্গে প্রবচন রাখেন দুর্গাবাহিনীর প্রতিষ্ঠাত্রী সাধ্বী ঋতম্ভরা দিদিমা। তাঁর প্রেরণামূলক প্রবচন শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। তিনদিনের এই বর্গে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ, নেতৃত্বের বিকাশ, সামাজিক দায়বদ্ধতা, নারীজাতির ভূমিকা এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয়, মতবিনিময় ও সাংগঠনিক চেতনা গড়ে তোলার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। ত্রিদিবসীয় এই বর্গ পরিচালনা করেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসল। বর্গের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনুপ কুমার মণ্ডল এবং সহ-প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক বুবাই নস্কর।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ঘোষিত পথ নিরাপত্তা পালনে সামাজিক সংগঠন 'ন্যায় ব্রতী'। গত ৮ আগস্ট সংগঠনের পক্ষ থেকে ৬ নং জাতীয় সড়কের পাশে মেদিনীপুর শহরের প্রবেশদ্বারে ধর্মাতে হেলমেটবিহীন মোটরবাইক এবং সিটবেল্টবিহীন মোটর কারের আরোহীদের সচেতন করেন সংগঠনের সদস্যরা। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও ৮১জন মানুষকে সচেতন করার প্রয়াস করা হয়।

ফঃ ৪

নিউটাউন কনভেনশন সেন্টারে জাতীয় মহিলা কমিশনের উদ্যোগে আলোচনা সভা

গত ৬ আগস্ট কলকাতার নিউটাউন কনভেনশন সেন্টারে জাতীয় মহিলা কমিশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা সভা—"Conclave on Road Map for the Development of Women in Pashchim Banga." অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে নারী উন্নয়নের রোডম্যাপ। পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের কাছে এই আলোচনা সভা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি উদ্যোগ। একটি দীর্ঘ সময়ের পর এটি কলকাতার বুকে নারীজাতির উন্নয়ন, নিরাপত্তা, অধিকার ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট মহিলাদের একত্রিত করে এক ধরনের একটি সর্বাঙ্গীণ আলোচনা সভা যা নিঃসন্দেহে একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন শ্রীমতী বিজয়া রাহাতকরের অনুরোধে মহিলা সমন্বয়ের পশ্চিমবঙ্গের আহ্বায়ক শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে মহিলাদের এই আলোচনা সভায় আমন্ত্রণ জানান। শিল্প ও সংস্কৃতি-সহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি সফল ও প্রাণবন্ত রূপ লাভ করে।

আলোচনাসভায় পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্যানেল আলোচনা হয়। এর মধ্যে ছিল স্বাস্থ্য, নারী নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা-শিল্প-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আইনি সহায়তা এবং নারীর জীবন ও মর্যাদার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন। ছিলেন ডাঃ অর্চনা মজুমদার, ডঃ সঙ্গীতা রেড্ডি, ডঃ অঞ্জুলা বিনায়কিয়া, ডঃ অঙ্গীরা দাশগুপ্ত, ডঃ মমতা চাওলা, পদ্মশ্রী গীতা রায়বর্মন, শ্রীমতী অলকা কানুনগো, ডঃ চৈতালি দাস, শ্রীমতী দেবযানী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী নন্দিনী রায় এবং প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীমতী সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

চিকিৎসা, আইন, শিক্ষা, সমাজসেবা, শিল্প ও সংস্কৃতি এবং অন্যান্য পেশাগত ক্ষেত্র থেকে বিশিষ্ট মহিলাদের অংশগ্রহণ আলোচনাকে আরও বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ করে তোলে। পাশাপাশি শিল্প ও সংস্কৃতি, সংবাদমাধ্যম ও শিক্ষাক্ষেত্রের কয়েকজন পুরুষ প্রতিনিধিও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। এর মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তাই উঠে এসেছে-- নারীর নিরাপত্তা, মর্যাদা ও উন্নয়নের জন্য সমাজের প্রতিটি স্তরের সম্মিলিত অংশগ্রহণ প্রায়োজন।

উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীমতী মালতী রাভা রায়, জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন শ্রীমতী বিজয়া রাহাতকর এবং এরাজ্যের হোম সেক্রেটারি শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন

গত ২ আগস্ট অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো বাঁকুড়ার গুরুদক্ষিণা লজে। সম্মেলনে আটশোর বেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সংগঠনের দুই শীর্ষ ব্যক্তিত্ব— পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল এবং বাঁকুড়া জেলার

সহ-সভাপতি সতীনাথ মণ্ডল মহাশয়ের দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবন ও সাংগঠনিক অবদানের জন্য শ্রদ্ধা জানিয়ে জেলা শাখার পক্ষ থেকে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সংবর্ধনা প্রদানান্তে রাজ্য সম্পাদিকা শ্রীমতী নবনীতা মণ্ডল সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য রাখেন। মানপত্র পাঠ করে শিক্ষক সঞ্জয় বারুই তা আশিসবাবুর হাতে তুলে দেন। অপরদিকে নবনীতা মণ্ডল মানপত্র পাঠ করে তা সতীনাথবাবুর হাতে তুলে দেন। উপস্থিত প্রতিনিধিদের করতালিতে দুই প্রবীণ সংগঠকের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ছাতনা ও শালতোড়ার বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী চন্দনা বাউড়ী। সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল নান্দনিক ও ঐতিহ্যমণ্ডিত মঞ্চসজ্জা। বাঁকুড়ার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও টেরাকোটা শিল্পের ভাবনাকে সামনে রেখে মঞ্চের পটভূমিকা ও প্রবেশদ্বার নির্মাণ করা হয়েছিল।

মেমারী কলেজ ও লোকপ্রজ্ঞার যৌথ উদ্যোগে মেমারী কলেজে আলোচনাসভা

পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারী কলেজ এবং অখিল ভারতীয় প্রবুদ্ধ মঞ্চ প্রজ্ঞাপ্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা লোকপ্রজ্ঞার যৌথ উদ্যোগে গত ১০ আগস্ট মেমারী কলেজে অনুষ্ঠিত হলো ‘বন্দে মাতরম্-১৫০ ও স্বাধীনতা থেকে স্বতন্ত্রতা’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক দিগন্ত চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সিলেবাস কমিটির সদস্য মিলন কুমার দে, কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ জয়তী ভট্টাচার্য, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা শ্রীকান্ত নন্দী, অধ্যাপক অভিষেক সাহা প্রমুখ। সভায় বক্তারা ভারতের গৌরবময় ইতিহাস-সহ বহু বিষয়ে আলোকপাত করেন। সভায় ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা-সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ পূর্তিতে মালদহে যাদব সভার অনুষ্ঠান

বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশপ্রেম, জাতীয় চেতনা এবং ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে গত ১০ আগস্ট যাদব সভার উদ্যোগে মালদা টাউন হলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন মন্ত্র উচ্চারণ করেন ডঃ বিজয় ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় যাদব মহাসভার সভাপতি শ্যামচাঁদ ঘোষ, বিধায়ক রাজু কর্মকার ও গৌরচন্দ্র মণ্ডল, বিশিষ্ট সমাজসেবী অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থসারথী ঘোষ, অজিত দাস, ডাঃ সন্দীপন ঘোষ, ডাঃ সুমন ঘোষ প্রমুখ। মঞ্চাসীন ব্যক্তিবর্গ ভারতমাতা ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয় ছিল, 'বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ ঃ ইতিহাস, তাৎপর্য ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা।' বক্তারা প্রত্যেকেই তাঁদের ভাষণে বলেন, বন্দে মাতরম্ শুধু একটি সঙ্গীত নয়, এটি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশপ্রেম, আত্মমর্যাদা এবং জাতীয় চেতনার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত একটি ঐতিহাসিক প্রতীক। বর্তমান প্রজন্মের কাছে এই ইতিহাস ও জাতীয় মূল্যবোধকে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপরও বক্তারা গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল যাদব সমাজের কৃতী ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে শিশুশিল্পীরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিধায়কদেরও সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সক্রিয় সহযোগিতায় ছিলেন মালদা জেলা যাদব সভার বুদ্ধিজীবী সেলের আহ্বায়ক শ্যামল ঘোষ, সহ-আহ্বায়ক ভরত ঘোষ, কৃষ্ণ ঘোষ, টিঙ্কু ঘোষ প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধ্যাপক শ্যামল ঘোষ।

হরিপালে বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে লোকপ্রজ্ঞার বন্দে মাতরম্ বিষয়ক আলোচনাসভা

হুগলী জেলার হরিপালের বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয় এবং অখিল ভারতীয় প্রবুদ্ধ মঞ্চ প্রজ্ঞাপ্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা লোকপ্রজ্ঞার যৌথ উদ্যোগে গত ৭ আগস্ট 'বন্দে মাতরম্-১৫০' বিষয়ক এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রজ্ঞাপ্রবাহের পূর্বক্ষেত্র সংযোজক অরবিন্দ দাশ এবং কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ডঃ শুভময় পাহাড়ী। উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মানবেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক মৈনাক কুমার দে, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সন্দীপ সিনহা-সহ বহু বিশিষ্ট গুণীজন।

‘রাখি’-র গল্পগুচ্ছ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

একে দুই, দুইয়ে এক

সরস্বতী তীরে ঋষি কণ্ঠে উদ্‌গীত হলো বেদমন্ত্র— ‘একোঽহম্ বহুস্যামঃ’— এক তিনি, বহু হলেন। অথবা এক সেই সত্য— জ্ঞানীরা তাকে দেখেন বহুরূপে, ডাকেনও বহু নামে।

ঋগ্বেদের ১।১৬৪।৪৬ এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের ‘একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি’ মন্ত্র দু'টির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত এক মানবিক দর্শন। জীবন ও মরণ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা সেই একেরই প্রকাশ। বাহ্যত অভিহিত তারা ভিন্ন নামে, ভিন্নরূপে।

একারণেই ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ প্রাণের আবেগে গেয়েছেন,— ‘আমি পরাণের সঙ্গে খেলিব আজিকে মরণ খেলা— নিশীথ বেলা।’ —এই পরাণ আর মরণ— দুই রূপ— সত্য এক। মরণেই পূর্ণতা জীবনের। এই জীবন নিয়েই তাই কত কথা— কতরূপ তার।

এই যে দু'য়ে মিলে এক— এরই নানা রূপ ছড়িয়ে আছে ভারতীয় ঐতিহ্য ও মননে। এই দুই সত্যকে সামনে রেখেই প্রবাহিত শাশ্বত— সনাতন জীবন। সেই জীবনখেলার খাতাতেই কোনো সময় লেখা হয় দু'টি নাম— রাখি ও ঝুলন।

ভিন্ন দু'টি উৎসব। কিন্তু একই তিথিতে যেন একই বার্তা নিয়ে আসে। সে বার্তা মিলনের— সে বার্তা একত্বের— সে বার্তা বহুত্বের মধ্যে একের অন্বেষণের। শ্রাবণের ঘন বরিষণ ধারায় পৃথিবীর বুক যখন ভরে ওঠে সবুজে— যখন আকাশ এসে মেশে মাটির পৃথিবীতে বৃষ্টিধারার মাধ্যমে, তখনই ভারতীয় মনন প্রীতির বন্ধনে নিকট করে সব কিছুকে। একা নই— আছে বহু জন— তারাই সব আত্মার আত্মীয়— অতি আপন জন, এমনই চেতনায় মিলে মিশে একাকার ভারতের দুই উৎসব— ঝুলন ও রাখি বা রক্ষাবন্ধন। শ্রাবণী পূর্ণিমা হয়ে ওঠে বিশ্বকে এক করার— আপন করার এক পরমক্ষণ।

শ্রাবণের শুক্লা একদশীতে সূচনা যার— সমাপ্তি পূর্ণিমায়। দ্বাপরের বৃন্দাবনে সে কী উল্লাস— কী আনন্দ। গোপ বালক-বালিকারা কদম গাছের ডাল থেকে ঝোলায় এক দোলনা। সাজায় ফুলে ফুলে। তারপর ‘দে দোল— দোল— দে দোল দোল’। এক হলেন রাধা-কৃষ্ণ। মিলন হলো জীবাত্মা-পরমাত্মার। সেই মিলন-দর্শনে সমবেত গোপ বালক- বালিকারাও হলো একাত্ম। সূচিত হলো এক আনন্দঘন উৎসব ঝুলন বা হিন্দোল।

> “সংহতি ও সৌহার্দের অনুষ্ঠান রাখির দিনে জাতি নতুন করে একাত্মতা ও সম্প্রীতিবোধে জাগ্রত হবার শপথ নেবে। এগিয়ে যাবে নতুন ভারত গড়ার পথে। রাখিবন্ধন হবে জাতির নতুন মার্গদর্শনের দিশা।”

আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আজও এক হয় বালক-বালিকা— নারী-পুরুষ। রক্তের সম্পর্কে এক না হয়েও নব নব সৃজনের খেলায় মাতে একাত্ম হয়ে পাঁচদিন ধরে। সনাতনী শিক্ষা ধারায় আলাদা করে ছেলে-মেয়েদের শিল্প-কলা-কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষা দিতে হতো না। পূজা-উৎসব, পালা-পার্বণের মধ্য দিয়েই হাতে কলমে আয়ত্ত হতো সেসব।

ঝুলন বা হিন্দোল বৈষ্ণবদের একটি বড়ো উৎসব হলেও ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তর অংশেই ঝুলন বা হিন্দোলের মধ্য দিয়ে সব সম্প্রদায়ের মানুষই বেঁচেবর্তে থাকার রসদ পায়। আর এই উৎসবের সঙ্গে রাখি বা রক্ষাবন্ধনের মেলবন্ধন ঘটায়। শ্রাবণী পূর্ণিমা একই সঙ্গে হয়ে উঠেছে শিব-সাধনা, বৈষ্ণব-সাধনা এবং জীবন-সাধনার এক মহান দিন।

বিশ্বাসের উৎসব

শ্রাবণী পূর্ণিমায় মন্দিরে মন্দিরে বেজে ওঠে কাঁসর ঘণ্টা। দোলায় বসিয়ে আরাধনা করা হয় রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ বা নিজের আরাধ্য দেব-দেবীর। একই সঙ্গে ঘরে ঘরে বেজে ওঠে মঙ্গল শঙ্খ। বোনেরা ভাইয়ের হাতে বেঁধে দেন মঙ্গল সূত্র— তাদের দীর্ঘ নিরাময়-বিপদহীন জীবনের কামনায়। অন্যদিকে ভাইয়েরাও নিজেদের অঙ্গীকারে হয় আরও দৃঢ়বদ্ধ। বোনকে সবরকম রক্ষা করার কথা জানিয়ে দেয় আশীর্বাদ দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে।

ভাই-বোনের পবিত্র সম্পর্কের এই যে মিলন গীতি তা উদ্‌গীত হয়ে আসছে স্মরণাতীতকাল থেকে। কেবল সহোদর ভাই-বোন বা আপন জনেরা নয়, সেদিক থেকে যাদের সঙ্গে নেই কোনো রক্তের সম্পর্ক অথচ আত্মিক-আকর্ষণে যারা পরস্পরের বন্ধু— সহযোগী-সমব্যথী— সব সুখদুঃখের সঙ্গী, জীবনপথের

সহ-অভিযাত্রী যারা— সেইসব নারী-পুরুষও এই দিনটিতে মঙ্গলসূত্রের মধ্য দিয়ে বাঁধা পড়েন চিরন্তন ভাই-বোনের সম্পর্কে। বস্তুত, রক্ষাবন্ধন— কেবলই একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। এটা হলো এক ধরনের মানবিক উৎসব। যে উৎসবে বসুধা হয়ে ওঠে কুটুম— আপনজন। তার চেয়েও বড়ো কথা, এই রাখিবন্ধন হলো একটা বিশ্বাসের উৎসব। কথা দেওয়া এবং কথা রাখার উৎসব। সামান্য কয়েক গাছা সাধারণ সুতো যে মানুষকে চিরকালের সম্পর্ককে বেঁধে রাখে— রাখিবন্ধন তারই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উৎসের খোঁজে

ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছে এই রাখি পরানো বা রক্ষাবন্ধন উৎসব? না, তার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ নেই। তবে পুরাণ, মহাকাব্য বা নানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে যা জানা যায়, তার থেকে স্পষ্ট, বহু ভারতীয় পূজাপার্বণ, অনুষ্ঠান বা উৎসবের মতোই রক্ষাবন্ধনের উৎসও রয়েছে ভারতের সমাজ এবং লোকজীবনের ইতিহাসে। উৎসবের রূপ এবং বিভিন্ন প্রশ্নের কাহিনির ইঙ্গিত, ধর্মীয় দিকটির চেয়েও এক ধরনের পারিবারিক ও সামাজিক প্রয়োজন বা অনুভব থেকেই শুরু হয়েছে এ উৎসবের। ব্যক্তিগতের চেয়ে এক ধরনের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থবোধ থেকেই এই উৎসবের শুরু। তাই দৃষ্টিপাত করা যাক রক্ষাবন্ধন সম্পর্কিত কাহিনিগুলিতে।

পুরাণ ও মহাকাব্যগুলিতে এই অনুষ্ঠানের চরিত্র হিসেবে যাঁদের নাম পাওয়া যায়, তার থেকে স্পষ্ট যে, দেবতা, দৈত্য থেকে রাষ্ট্রনায়ক বা ঐতিহাসিক নারী-পুরুষ এক ধরনের বিশ্বাস ও অঙ্গীকার থেকেই এই রাখিবন্ধন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তাই-বা কেন, এই উৎসবের প্রসারের ক্ষেত্রেও রয়েছে তাঁদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আর তার থেকেই কেউ মনে করেন দেবরাজ-ঘরনি ইন্দ্রাণী প্রথম রক্ষাবন্ধনের প্রচলন করেন। অন্যদিকে কেউ কেউ মনে করেন দেবী লক্ষ্মী, যমুনা, মা সন্তোষী হলেন এই উৎসব শুরুর প্রথম চরিত্র। মাতা কুন্তী, পাণ্ডব-গৃহিণী দ্রৌপদী এই উৎসবের সূচনা করেন। আবার এই উৎসবের সঙ্গে বীর রাজা পুরু ও আলেকজান্ডার, বাদশাহ হুমায়ুন ও রানি কর্ণাবতীর নামও যুক্ত রয়েছে।

রাখি বোন দেবী লক্ষ্মী

দানের নেশায় মত্ত হয়েছিলেন দৈত্যরাজ বলি। গুরু শুক্রাচার্যর নিষেধ না মেনেই বামনরূপী শ্রীবিষ্ণুকে ত্রিপাদ ভূমি দিতে রাজি হন তিনি। ছলনাময় বামনরূপী শ্রীবিষ্ণু এক পায়ে আকাশ, দ্বিতীয় পায়ে পৃথিবী-সহ ত্রিলোক দখল করে তৃতীয় পদটি রাখার জায়গা চাইলেন। সব বুঝেও বলি নত হলেন। বাড়িয়ে দিলেন নিজের মাথা। পায়ের চাপে বলিকে বদ্ধ করলেন সুতলে। একইসঙ্গে তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও ভক্তিতে তৃপ্ত হয়ে নিজে হলেন বলির দ্বাররক্ষী।

পতি বিরহে অস্থির দেবী লক্ষ্মী। শেষে নিজেই গেলেন সুতলে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে। দরজা খুলতেই বলির হাতে বেঁধে দিলেন একটি মঙ্গলসূত্র। বললেন, এই সূত্রই রক্ষা করবে তোমাকে সব বিপদ থেকে।

এই আকস্মিকতায় মুগ্ধ বলি বলেন, এই সুতো দেওয়ার ফলে আজ থেকে তুমি হলে আমার বোন। এবার বলো, কী উপহার দেব তোমাকে?

—যা চাইব, দেবে!

—চেয়েই দেখো না।

লক্ষ্মী বলেন, চাই তোমার ওই দ্বাররক্ষীকে। উনি আমার স্বামী, ওঁকেই উপহার দাও আমাকে।

বলি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন সব। তাই এতটুকু ইতস্তত করলেন না। বললেন, বোন হয়ে তুমি যখন এই উপহার চেয়েছে তখন নিশ্চয় দেব। তুমি নিয়ে যাও তোমার স্বামীকে আমার উপহার হিসেবে।

সে দিনটা ছিল শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা রাখিপূর্ণিমা। অবশ্য দিনটি বলিভা বা বলভা নামেও পরিচিত।

স্বামীকে রাখি পরান ইন্দ্রাণী

ভবিষ্য পুরাণের কাহিনি। রাখি পূর্ণিমায় ভাই নয়, স্বামীকে প্রথম রাখি পরানো হয়। সে রাখি পরান ইন্দ্রাণী বা শচী তাঁর স্বামী দেবরাজ ইন্দ্রকে। এই ঘটনারও একটি মুখ্য চরিত্র দৈত্যপতি বলি। দেবরাজ ইন্দ্র বারবার পরাজিত হন বলির কাছে। বিতাড়িত হন স্বর্গ থেকেও। স্বামীর দুর্দশায় ব্যথিত শচীদেবী শরণ নেন শ্রীবিষ্ণুর। শচীদেবী ও দেবরাজের দুঃখের কথা শুনে বিগলিত শ্রীবিষ্ণু। তিনি ক'গাছা সুতো দেন শচীদেবীকে। বলেন, এটা বেঁধে দাও তোমার স্বামীর হাতে। এটা পরেই তিনি যেন যুদ্ধে যান। তাহলেই পরাজিত হবে বলি।

শ্রীবিষ্ণুর কথামতোই কাজ করেন শচীদেবী। ইন্দ্রকে রাখি পরিয়ে পাঠান যুদ্ধে। জয়ী হয়ে ইন্দ্র করেন স্বর্গ উদ্ধার। বসেন অমরার সিংহাসনে। বিষ্ণুর দেওয়া ওই সুতো বা রাখি পরানোর ফলেই জয়ী হন ইন্দ্র। শচীদেবীর ইন্দ্রকে ওই রাখি পরানোর দিনটি ছিল শ্রাবণী পূর্ণিমা। এরপর থেকেই ওই দিনটিতে রাখি পরানোর অনুষ্ঠান চালু হয়।

এটি অবশ্য অন্য কাহিনি। পরাজিত ইন্দ্র যান দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে প্রতিকারের আশায়। বৃহস্পতিই বলেন, মন্ত্রপূত মঙ্গলসূত্র হাতে বেঁধে যুদ্ধে যেতে। দেবগুরুর নির্দেশ মতো ইন্দ্রাণী স্বামীর হাতে বেঁধে দেন ওই সুতো বা রাখি। ইন্দ্র সেই রাখি পরে যুদ্ধে গিয়ে সহজেই দৈত্যদের হারিয়ে দেন। ইন্দ্রকে ওই রাখি পরানোর দিনটি ছিল শ্রাবণী পূর্ণিমা। আর তারপর থেকেই বিপদমুক্তির জন্য শ্রাবণী পূর্ণিমা পালিত হয় রাখি পূর্ণিমা হিসেবে।

রাখি পরান মা সন্তোষী

শুভ ও লাভ। গণেশের দুই ছেলে। একদিন তারা দেখে, পিতা গণেশের হাতে রাখি বাঁধছেন তাঁর বোন। দেখেই বায়না শুভ ও লাভের, তারাও রাখি পরবে। তার জন্য তারা বোন চায় বাবার কাছে।

গণেশ প্রথমে দুই ছেলের কথায় কান দেন না। কিন্তু তাদের কান্নাকাটি শুনে নারদ এসে গণেশকে বোঝান। বলেন, তাঁর কন্যা অনেক সমৃদ্ধি ও পবিত্রতা নিয়ে আসবে তাঁর জীবনে। অতএব—

নারদের কথায় রাজি হন গণেশ। দুই স্ত্রী ঋদ্ধি ও সিদ্ধির অগ্নিশিখা থেকে সৃষ্টি করেন এক কন্যা। নাম দেন তার সন্তোষী। বোন পেয়ে খুশি শুভ ও লাভ। বোন সন্তোষীর হাত থেকে শ্রাবণী পূর্ণিমায় রাখি পরেন দুই ভাই।

যম ও যমুনা

মৃত্যুর দেবতা যম। বোন তার যমুনা। কোনো এক কারণে বারো বছর যম আসেন না যমুনার কাছে। দাদাকে দীর্ঘদিন দেখতে না পেয়ে বিষণ্ণ যমুনা গঙ্গার কাছে কেঁদে পড়েন। বলেন, দাদা যেন আমার বাড়ি

আসে এর একটা ব্যবস্থা করো তুমি।

যমুনার কথায় মন গলে গঙ্গার। তিনি যমকে বলেন যমুনার বাড়ি যাওয়ার জন্য। রাজি হন যম।

যম আসছেন শুনে ভারি খুশি যমুনা। দাদার জন্য রাঁধেন নানা খাবার। যম আসতেই বরণ করেন তাঁকে রাখি পরিয়ে। যমুনার এই ভালোবাসায় অভিভূত যম বলেন— বোন, তুমি আমার হাতে রাখি পরালে, বলো কী উপহার দেব তোমায়?

—কথা দাও, মাঝে মাঝে তুমি আসবে আমার বাড়ি। সেটাই হবে আমার শ্রেষ্ঠ উপহার।

প্রীত যম বোনকে দিলেন অমরত্বের বর। দাদার সেই বরের কারণেই যমুনা বয়ে চলেছে এখনো কুলুকুলু নাদে।

শ্রীকৃষ্ণকে রাখি পরান দ্রৌপদী

পুরাণ ও মহাভারতের কথা। সেদিন মথুরায় অন্তঃপুরে বসে ছুরি দিয়ে আখ কাটছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকে ঘিরে ছিলেন তাঁর রানি রুক্মিণী, সত্যভামা এবং অনেকের সঙ্গে সখী দ্রৌপদীও। চলছে নানা রঙ্গরসিকতা। আর তাতেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন শ্রীকৃষ্ণ। ছুরিতে কেটে যায় তাঁর হাত। গলগল করে পড়তে থাকে রক্ত। রক্ত দেখে রুক্মিণী, সত্যভামারা ঘাবড়ে গিয়ে লোকজনকে ডাকাডাকি শুরু করে দেন। দ্রৌপদী কিন্তু ওই সময় সাধারণ বুদ্ধি হারান না। তাড়াতাড়ি নিজের শাড়ির কাপড় ছিঁড়ে শ্রীকৃষ্ণের আঙুলে বেঁধে দেন। বন্ধ হয় রক্তপাত।

দ্রৌপদীর উপস্থিত বুদ্ধি ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হন শ্রীকৃষ্ণ। বলেন, সখি, আজ তুমি বোনের মতো এগিয়ে এসে যেভাবে আমাকে অতি-রক্তপাতের হাত থেকে রক্ষা করলে তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। কথা দিচ্ছি, যখনই তুমি বিপদে পড়বে, তোমাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসব আমি।

ঘটনাটি ঘটে শ্রাবণী পূর্ণিমার দিনে। আর ওই ঘটনা থেকেই দিনটি পালিত হয় রাখি পূর্ণিমা হিসেবে। বলা হয়, নিজের কথা রাখতেই শ্রীকৃষ্ণ কৌরব সভায় লাঞ্ছিত দ্রৌপদীকে বস্ত্র জুগিয়ে যান। দ্রৌপদী রক্ষা পান বিবস্ত্র হবার লজ্জা থেকে।

অবশ্য অন্য এক কাহিনিতে বলা হয়, ঘটনাটি ঘটেছিল শিশুপাল বধের সময়। শ্রীকৃষ্ণের হাত থেকে নিক্ষিপ্ত সুদর্শন চক্রে অঙ্গুল কেটে যায় তাঁর। সেই সময় দ্রৌপদী নিজের কাপড় ছিঁড়ে শ্রীকৃষ্ণের আকুল বেঁধে দিয়েছিলেন। এই ভাবে কাপড় বেঁধে রক্তপাত বন্ধ করার ঘটনা থেকেই রাখিবন্ধন উৎসবের সূচনা। বলা হয়, বোনেরা এই ভাবে রাখি পরিয়ে ভাইদের জীবন নিরাপদ করেন। ভাইয়েরাও একই ভাবে বোনেদের রক্ষা করেন সব ধরনের সংকটের হাত থেকে।

শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির রাখি-সংবাদ

ভবিষ্য পুরাণের কাহিনি। যুধিষ্ঠিরকে রাখি উৎসবের কথা শোনান শ্রীকৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঠিক আগে যুধিষ্ঠির যান শ্রীকৃষ্ণের কাছে। যুদ্ধের ভয়াবহতা ও পরাজয়ের হাত থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যাবে তার উপায় জানতে চান তিনি। সেইসময় শ্রীকৃষ্ণ শোনান বলির বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ইন্দ্রের হাতে ইন্দ্রাণীর রাখি বাঁধার কাহিনি। বলেন, শ্রাবণী পূর্ণিমায় রাখি-উৎসব পালন করতে। বলেন, ওই পূর্ণিমায় রাজপুরোহিতকে দিয়ে ডান হাতের মণিবন্ধে মন্ত্রপূত মঙ্গলসূত্র বাঁধার কথা। তাতেই জয় আসবে বলে জানান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর সেকথা মেনে শ্রাবণী পূর্ণিমায় ডান হাতে রাখি পরেন যুধিষ্ঠির। আর শেষ পর্যন্ত যে পাণ্ডবরাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়ী হন, সেকথা নতুন করে বলার দরকার নেই।

অভিমুন্যকে রাখি পরান কুন্তীদেবী

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় নাতি অভিমন্যুর হাতে রাখি বেঁধে দেন পাণ্ডবজননী কুন্তীদেবী। বলেন, যতদিন অভিমন্যুর হাতে এই রাখি থাকবে, অভিমন্যু ততদিন থাকবে অবধ্য। মৃত্যু হবে না তার। বলা যায় কুন্তী বেঁধে দেন তার হাতে মৃত্যুঞ্জয় রাখি।

সমস্যায় পড়েন শ্রীকৃষ্ণ। প্রারব্ধ বা কর্মফলের জন্য যুদ্ধে অভিমন্যুর মৃত্যু যে পূর্ব নির্ধারিত। ওদিকে কুন্তীর সংকল্পও ব্যর্থ হবার নয়। তাই এক কূটকৌশলের আশ্রয় নেন শ্রীকৃষ্ণ। একটি ইঁদুরের রূপ নিয়ে শিবিরে ঢুকে ঘুমন্ত অভিমন্যুর হাতে বাঁধা রাখিটি কেটে দেন। আর তারই ফল চক্রব্যূহে মৃত্যু হয় অভিমন্যুর। সফল হয় নিয়তি।

রাখিতেই রক্ষা আলেকজান্ডারের

পুরাণ-মহাকাব্যর বাইরে ইতিহাসেও আছে রাখিবন্ধনের কথা। সেটা খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দের কথা। ভারত অভিযানে আসেন গ্রিক বীর আলেকজান্ডার। পারস্য জয় শেষে ভারতে আসার পর কিন্তু বাহিনীর মধ্যে একটা ভীতির ভাব দেখা যায়। আলেকজান্ডারের স্ত্রী মহারানি রোকসনা সেই ভয় থেকেই পৌরবরাজ পুরু বা পুরুষোত্তমের সঙ্গে রাখিভাই পাতান। তারই ফলে যুদ্ধে পরাজিত আলেকজান্ডারকে হত্যা করার সময় হাতের রাখি দেখে সংযত হন পুরু। রক্ষা পান আলেকজান্ডার। অবশ্য এসবই কিংবদন্তি।

আরও কাহিনি

একই ভাবে শোনা যায়, চিতোরের রানি কর্ণাবতীও রাখি পাঠিয়ে ভাই সম্পর্ক পাতিয়েছিলেন মুঘল বাদশা হুমায়ুনের সঙ্গে। তারই ফলে বাহাদুর শাহ চিতোর আক্রমণ করলে সবকিছু ফেলে রাখিবোনকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন হুমায়ুন। অবশ্য তিনি পৌঁছাবার আগেই চিতোরের পতন ঘটে। রানি কর্ণাবতীও জহরব্রতে প্রাণ বিসর্জন দেন।

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশের হাতে শিখ সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে রণজিৎ সিংহেব স্ত্রী মহারানি জিন্দল কাউর একইভাবে নেপালের রাজা জংবাহাদুরের সঙ্গে রাখিভাই পাতিয়ে সেখানেই আশ্রয় পান।

রাখি ও রবীন্দ্রনাথ

রাখিবন্ধনের আধুনিক ইতিহাসের ধারায় ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ যে রাখিবন্ধন ও সংহতি দিবস পালনের ডাক দেন, নানা কারণেই তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ডাকা ওই দিবসের জন্য রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গান 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল।'

অ-শেষ কথা

এইসব ঘটনার প্রেক্ষিতে এবারের রাখিবন্ধন দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী। সংহতি ও সৌহার্দের অনুষ্ঠান রাখির দিনে জাতি এবার নতুন করে একাত্মতা ও সম্প্রীতিবোধে জাগ্রত হবার শপথ নেবে। এগিয়ে যাবে নতুন ভারত গড়ার পথে। রাখিবন্ধন হবে জাতির নতুন মার্গদর্শনের দিশা— এ প্রত্যাশা করাই যায়। □

রাখিবন্ধন : জাতীয় চেতনা ও সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবোধের এক চিরন্তন উৎসব

কিশোর বর্মণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'যেখানে সম্পর্ক কেবল রক্তের বন্ধনে সীমাবদ্ধ নয়, বরং কর্তব্য, বিশ্বাস ও আত্মীয়তার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত— সেখানেই ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃত পরিচয়।' রাখিবন্ধন সেই ভারতীয় সভ্যতারই এক অনন্য সাংস্কৃতিক প্রতীক। এটি কেবল ভাই-বোনের আবেগের উৎসব নয়; বরং ভারতীয় সংস্কৃতিতে রক্ষা, ধর্ম, সম্প্রীতি, দায়িত্ব ও জাতীয় ঐক্য— এই পাঁচটি মৌলিক মূল্যবোধের এক জীবন্ত প্রকাশ।

ভারতবর্ষের উৎসবগুলিকে যদি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তবে দেখা যাবে এগুলো শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার নয়; বরং সমাজ সংগঠন, নৈতিক শিক্ষা এবং রাষ্ট্রচিন্তারও বাহক। সেই অর্থে রাখিবন্ধন এমন একটি উৎসব, যা বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক ভারত পর্যন্ত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার সাংস্কৃতিক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উৎসবকে জাতীয় সংহতির প্রতীকে রূপান্তরিত করেন। স্বাধীনতার পরও এই উৎসব ভারতীয় সমাজে ভ্রাতৃত্ব, নারীসম্মান, সামাজিক সম্প্রীতি এবং জাতীয় কর্তব্যবোধকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

আজ 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর অভিযাত্রায় রাখিবন্ধন নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কারণ উন্নত দেশ গড়তে কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়, প্রয়োজন সামাজিক আস্থা, সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় এবং জাতীয় সংহতি।

রাখিবন্ধনের ধারণা ভারতীয় ধর্ম-দর্শনে 'রক্ষাসূত্র' নামে সুপ্রাচীন। অথর্ববেদে বিভিন্ন যজ্ঞ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রক্ষাসূত্র ধারণের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে এটি অশুভ শক্তি থেকে সুরক্ষা, মানসিক দৃঢ়তা ও ধর্মপালনের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

ভবিষ্য পুরাণে দেবাসুর সংঘর্ষের সময় দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী শচী (ইন্দ্রাণী) মন্ত্রপূত রক্ষাসূত্র ইন্দ্রের হাতে বেঁধে দেন। এর পরেই ইন্দ্র যুদ্ধজয় করেন। এখান থেকেই রক্ষাবন্ধনের ধর্মীয় তাৎপর্য বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আজও বহু স্থানে যে সংস্কৃত মন্ত্রটি উচ্চারিত হয়, তা ভবিষ্য পুরাণ-প্রসূত বলে বিবেচিত—

যেন বদ্ধো বলী রাজা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ।
তেন ত্বামনুবধ্নামি রক্ষে মা চল মা চল।।

অর্থাৎ 'যে রক্ষাসূত্রে মহাবলী বলিরাজা আবদ্ধ হয়েছিলেন, সেই সূত্রেই তোমাকে আবদ্ধ করছি; তুমি অটল থাকো, তোমার রক্ষা হোক।'

মহাভারতে দ্রৌপদী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের আঙুলে কাপড় বেঁধে দেওয়ার ঘটনা এবং পরবর্তীকালে কুরুসভায় শ্রীকৃষ্ণের দ্রৌপদীকে রক্ষা করা ভারতীয় সংস্কৃতিতে পারস্পরিক কর্তব্য ও রক্ষার চিরন্তন প্রতীক হয়ে আছে। যদিও এটি বর্তমান রাখি উৎসবের প্রত্যক্ষ বর্ণনা নয়, তবু রক্ষার নৈতিক দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে রাজা বলি, ভগবান বিষ্ণু ও দেবী লক্ষ্মীর কাহিনিতে দেবী লক্ষ্মী বলিকে রক্ষাসূত্র বেঁধে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন। এখানে রক্তের সম্পর্ক নয়, মূল্যবোধের সম্পর্কই মুখ্য।

স্কন্দ পুরাণ এবং বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রেও ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজমানদের রক্ষাসূত্র ধারণ করানোর উল্লেখ রয়েছে, যা পরবর্তীকালে সামাজিক উৎসবে রূপান্তরিত হয়।

অতএব, রক্ষাসূত্রের মূল দর্শন কেবল ব্যক্তিগত সুরক্ষা নয়; এটি ধর্ম, দায়িত্ব, আস্থা ও সামাজিক বন্ধনের প্রতীক।

প্রাচীন ভারতে উপাকর্ম, যজ্ঞ ও বৈদিক শিক্ষার সূচনায় রক্ষাসূত্র ধারণ ছিল একটি প্রচলিত আচার। পরবর্তীকালে এটি পরিবার ও সমাজের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের প্রতীকে পরিণত হয়।

মধ্যযুগে রাজপুত সমাজে রানিরা প্রতিবেশী রাজাদের রাখি পাঠিয়ে সম্মানরক্ষার অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন। রানি কর্ণাবতী ও মুঘল বাদশা হুমায়ুনকে ঘিরে যে কাহিনি জনপ্রিয়, তার ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ফলে এটিকে লোকপ্রচলিত ঐতিহ্য হিসেবে দেখা অধিকতর সমীচীন। তবে এই কাহিনি রাখির সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে জনপ্রিয় করেছে।

ঔপনিবেশিক যুগে রাখিবন্ধন এক নতুন রাজনৈতিক অর্থ লাভ করে। এখানেই এর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হয়। ১৯০৫ সালে বড়লাট কার্জনের বঙ্গভঙ্গ

সিদ্ধান্ত ব্রিটিশের 'Divide and Rule' নীতিরই অংশ ছিল। এর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তা বিশ্ব ইতিহাসেও এক অভিনব দৃষ্টান্ত।

তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মানুষকে একে অপরের হাতে রাখি বাঁধার আহ্বান জানান। তাঁর কাছে রাখি ছিল সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিরুদ্ধে মানবিক ঐক্যের প্রতীক।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল— পুণ্য হউক।' এই গান কেবল দেশপ্রেম নয়; অবিভক্ত বঙ্গ তথা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যেরও এক অমর দলিল।

১৬ অক্টোবর ১৯০৫, বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার দিন, কলকাতা ও বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে রাখি বন্ধনের মাধ্যমে সম্প্রীতির যে আন্দোলন সংগঠিত হয়, তা প্রমাণ করে— সংস্কৃতি রাজনৈতিক প্রতিরোধেরও শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য মানবধর্ম, ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমানবতার দর্শনে সমৃদ্ধ। রাখিবন্ধনের চেতনা তাঁর বহু রচনায় প্রতিফলিত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দে মাতরম্'-এর মাধ্যমে মাতৃভূমিকে দেবীমূর্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাতৃভূমির রক্ষার আদর্শ রাখির অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সাহিত্য ও কবিতায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের যে আহ্বান জানিয়েছেন, তা রাখিবন্ধনের সামাজিক দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— 'সম্প্রসারণই জীবন, সংকীর্ণতাই মৃত্যু।' রাখিবন্ধনের দর্শনও সংকীর্ণ পরিচয় অতিক্রম করে বৃহত্তর সামাজিক ঐক্যের শিক্ষা দেয়।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রাখির ভিন্ন ভিন্ন রূপ— রাজস্থানে লুম্বা রাখি, মহারাষ্ট্রে নারালী পূর্ণিমা, দক্ষিণ ভারতে আবণী অবিত্তম— প্রমাণ করে যে, বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি।

সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবোধের আলোকে রাখিবন্ধন এক চিরন্তন উৎসব। ভারতীয় চিন্তায় 'রাষ্ট্র' কেবল রাজনৈতিক পরিভাষা নয়; এটি একটি সাংস্কৃতিক ও সভ্যতাগত সত্তা। এই ধারণা স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিন্তায় বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবদর্শন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে এক অবিচ্ছিন্ন একক হিসেবে বিবেচনা করে। রাখিবন্ধনও সেই ধারাবাহিক সম্পর্কেরই প্রতীক।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Foundations of Indian Culture গ্রন্থে ভারতীয় সংস্কৃতিকে জাতীয় জীবনের আত্মা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, ভারতের ঐক্য রাজনৈতিক ক্ষমতার ফল নয়; এটি সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার ফসল।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন, ভারতের জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি তার সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়। রাখিবন্ধন সেই সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়কে সামাজিক আচারে রূপ দেয়। এই প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট করা জরুরি যে, সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবোধ কোনো সম্প্রদায়বিরোধী ধারণা নয়; বরং ভারতের বহুত্ববাদী ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা এবং যৌথ নাগরিক চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি দৃষ্টিভঙ্গি। রাখিবন্ধনের ঐতিহাসিক ব্যবহার— বিশেষত রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ— এই সর্বসমাবেশক চরিত্রেরই উদাহরণ।

আজকের প্রেক্ষাপটে নতুন অর্থে রাখিবন্ধন উৎসবকে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন সময়ে সীমান্তে কর্মরত জওয়ান, নিরাপত্তারক্ষী, শিশু ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নারীদের কাছ থেকে রাখি গ্রহণ করেছেন। তাঁর বক্তব্যে রাখি বন্ধন বহুবার নারীসম্মান, সামাজিক সংহতি এবং দেশের প্রতি দায়িত্ববোধের উৎসব হিসেবে উঠে এসেছে।

'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত', 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও', নারী নেতৃত্বের প্রসার এবং জনঅংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের মতো উদ্যোগগুলোর সঙ্গে রাখির মূল্যবোধের একটি স্বাভাবিক সংযোগ রয়েছে— যদিও এগুলো আলাদা সরকারি কর্মসূচি।

বর্তমানে বহু বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান রাখি উৎসবকে সামাজিক সম্প্রীতি, রক্তদান, বৃক্ষরোপণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও নারী-নিরাপত্তা সচেতনতার সঙ্গে যুক্ত করছে। ফলে এই উৎসবের সামাজিক পরিসর ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে।

অতীতে এই উৎসব যতটা প্রাসঙ্গিক ছিল বর্তমান সময়েও রাখিবন্ধন উৎসব ততটাই প্রাসঙ্গিক। ডিজিটাল যুগ মানুষকে প্রযুক্তিগতভাবে সংযুক্ত করলেও সামাজিকভাবে অনেক ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্ন করেছে। পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হওয়া, একাকিত্ব, সামাজিক অবিশ্বাস ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মতো চ্যালেঞ্জের মুখে রাখিবন্ধন নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে।

আজ রাখিবন্ধন আমাদের শেখায়— নারীকে সম্মান করা সামাজিক দায়িত্ব। পরিবার সামাজিক স্থিতিশীলতার প্রথম প্রতিষ্ঠান। জাতীয় ঐক্য পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের নৈতিক অঙ্গীকার।

বহু অঞ্চলে বৃক্ষের কাণ্ডে রাখি বেঁধে পরিবেশ সংরক্ষণের অঙ্গীকার করা হচ্ছে। এই উদ্যোগ রাখিবন্ধনের দর্শনকে প্রকৃতির সঙ্গেও যুক্ত করেছে।

এখন আমাদের লক্ষ্য 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'। ২০৪৭-এর মধ্যে এই বিকশিত ভারত গঠনে রাখি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্য কেবল অর্থনীতি, পরিকাঠামো বা প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একটি উন্নত দেশের জন্য প্রয়োজন নৈতিক নাগরিক, দায়িত্বশীল পরিবার, সংহত সমাজ এবং শক্তিশালী সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাস। রাখিবন্ধনের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ— বিশ্বাস, দায়িত্ব, সম্মান, আত্মত্যাগ ও পারস্পরিক সুরক্ষা— এই জাতীয় চরিত্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান। ভারতের উন্নয়নের এই যাত্রায় এই উৎসব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, উন্নয়নের প্রকৃত ভিত্তি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা এবং সমাজের সাংস্কৃতিক শক্তি।

রাখিবন্ধন ভারতীয় সভ্যতার এমন এক উৎসব, যা বৈদিক রক্ষাসূত্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, ভারতীয় সাহিত্য, সামাজিক সম্প্রীতি এবং সমকালীন জাতীয় জীবনের নানা স্তরকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে। এই উৎসবের মূল বার্তা— রক্ষা, দায়িত্ব, সম্মান, সম্প্রীতি ও ঐক্য— আজও সমান প্রাসঙ্গিক। এটি কোনো একটি সম্প্রদায় বা সম্পর্কের সীমায় আবদ্ধ নয়; বরং ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে জাতির মধ্যে বিশ্বাসের সেতুবন্ধন রচনা করে।

'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর পথে এগিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়, সামাজিক সংহতি এবং পারস্পরিক দায়িত্ববোধই একটি শক্তিশালী দেশের প্রকৃত ভিত্তি। রাখিবন্ধন সেই ভিত্তিকে দৃঢ় করার এক অনন্য সাংস্কৃতিক প্রেরণা— যা অতীতের ঐতিহ্যকে ধারণ করে বর্তমানকে সমৃদ্ধ করে এবং ভবিষ্যতের ভারতের জন্য একটি মূল্যবোধনির্ভর পথনির্দেশ দেয়।

[লেখক ত্রিপুরা সরকারের উচ্চশিক্ষা, পঞ্চায়েত ও সাধারণ প্রশাসন (রাজনৈতিক) দপ্তরের মন্ত্রী]

ফঃ ৫

লৌহকপাটের আড়ালে ষোলো মাস

বিজয় আঢ্য

কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি এরকম একটা দিন জীবনে আসবে। পঞ্চাশ বছরের পুরানো সেইসব বন্ধুদের দেখা পেয়ে যে কী আনন্দ অনুভব করেছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের দাবিতে যাঁরা লৌহকপাটের আড়ালে ছিলেন, তাঁদের সম্মান জানানোর জন্য গত ৯ আগস্ট, ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত বিজেপি সরকার নবান্নের সভাঘরে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছিল। সেই সূত্রেই অতীতের সেই কয়েকটা মাসের স্মৃতিচারণ। 'স্মৃতি সততই সুখের' কথাটা বলা হলেও ঁনন্দলাল কাটের মতো কয়েকজন সহযোদ্ধাদের যখন না দেখি, তখন এই আনন্দের আবহেও মনটা বেদনায় ভরে যায়।

'কারাগার' কথাটা সেই ছোটোবেলা থেকে শুনছি। ঝুলন দেখাতে নিয়ে গিয়ে ঠাকুমা বলেছিলেন, এই দ্যাখ, কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছে। পরবর্তীকালে ২০ জুন, ১৯৭৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার জরুরি অবস্থা জারি করে এবং এই সূত্রে ৪ জুলাই, ১৯৭৫ তারিখে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা হয়। সারা দেশে মিসা আইনে ৩০ হাজার ব্যক্তিকে আটক করা হয়। গণতন্ত্র রক্ষা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও সংবাদপত্রের উপর থেকে 'সেন্সরশিপ' তুলে নেওয়ার দাবিতে লোক সংঘর্ষ সমিতির নেতৃত্বে ১ লক্ষ ৭০ হাজার সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেন। সেই সময়ে সঙ্ঘের সকল প্রচারককে নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে থাকার কথা বলা হয়েছিল। তখন আরামবাগ মহকুমা প্রচারকের দায়িত্ব ছিল। ২১ জুলাই আরামবাগ তালতলা বাজারে ডিআইবি কর্তৃক গ্রেপ্তার হই। থানায় নিয়ে আসা ও সঙ্ঘের স্থানীয় কার্যালয়ে তল্লাশি চালানো হয়। পরদিন সকালে প্রকাশ্যে হাতকড়া ও কোমরে দড়ি বেঁধে দুজন অভিযুক্তের সঙ্গে আরামবাগ মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। আদালতে 'আমার কী অপরাধ, স্যার' জিজ্ঞাসা করলে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের (SDJM) প্রত্যুত্তর— আপনাদের উপর সরকারের কড়া নজর আছে। এরপরে উপস্থিত ব্যবহারজীবীদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন— 'আপনারা এঁদের ধরেছেন অথচ ২৭ পয়সার পাউরুটি ৩০ পয়সায় বিক্রি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে কিছুই করছেন না। প্রত্যুত্তরে একজন ব্যবহারজীবীর মন্তব্য— 'আমাদের স্যার এব্যাপারে কিছু করার নেই।' পরে কোর্ট লকআপ থেকে আরামবাগ সাব জেলে নিয়ে আসা হয়।

ভেতরে ঢুকতেই কয়েদিদের একজন আমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'বি-ক্লাস' নয়। মনে আশা জাগল, 'এ-ক্লাস'। চোর-জোচ্চোরদের সঙ্গে থাকতে হবে না। কিন্তু জেল লকআপে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর সেই ভুল ভাঙল। ঘরটা বড়ো হলেও এত লোক যে রাত্রিতে চিৎ হয়ে শোওয়া যাবে না। সবাইকে পাশ ফিরে শুতে বলা হলো। সকালে চ-খাওয়ার অভ্যাস। প্রায় একটানা তেইশদিন চা নেই। জেলের ভেতরে টাকাপয়সার চল নেই। কিন্তু 'বাটার সিস্টেম' আছে। কিন্তু বিড়ি বা সাবান— এ ধরনের কিছু জিনিস বিনিময়-মূল্য হিসেবে কাজ করে। যারা দেখা করতে আসতেন তাদের কাছে এসব চাইলে তারা ভাবতেন, এরই মধ্যে কী অধঃপতন। বিজয়দা বিড়ি খাওয়া শুরু করেছে! সুকুমার সরকার রমাপদ (পাল), চন্দ্রনাথ (দাস-VHP) বা এরকম কয়েকজন এসব দিতে আসত।

জেল জীবন প্রায় ষোলো মাস। ২১.০৭.৭৫ থেকে ২৯.১০.৭৬। প্রথমে

আরামবাগ সাব জেল, পরে কয়েকদিনের জন্য পর্যায়ক্রমে হুগলী ডিস্ট্রিক জেল/আরামবাগ সাব জেল। তবে বেশিরভাগ সময়টাই হুগলী জেলে। এর মধ্যে পাঁচ-ছ মাস সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে থাকার সুযোগ হয়েছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশই সঙ্ঘের পরিচিত স্বয়ংসেবক। অন্যরা হলেন প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ জন। তাঁরা লোকসংঘর্ষ সমিতির হয়ে সত্যাগ্রহ করেছিলেন। এরা সবাই আরামবাগের। যাঁদের নাম মনে আছে তাঁরা হলেন--- রজতদা (আরামবাগ), গৌরদা (গোঘাট), স্বরূপদা (গোঘাট)। রজতদা সারাদিন ধরে একটা খাতায় 'শ্রীরাম' নাম লিখতেন। স্বরূপদা দাবাখেলা শিখিয়েছেন। কলকাতায় দর্জিপাড়ার কালি দত্ত স্ট্রিটের পালুদাদুর চায়ের দোকানে দাবাখেলা হতো। সেখান থেকে মাঝে মধ্যেই 'খিস্তি' শব্দ শোনা যেত। ভাবতাম লোকগুলো কী অসভ্য। দাবা বাজে খেলা। পরে অবশ্য সেই ভুল ভেঙেছে। খিস্তি নয়, কিস্তি। এখন তো চেন্নাইয়ের বাচ্চারা দাবাখেলায় দেশের মুখ উজ্জ্বল করছে। স্বরূপদা রসিক ছিলেন। বলতেন, বাবা বললেন, তোর জন্য দেবীর মতো পাত্রী ঠিক করে এসেছি। বিয়ের পিঁড়িতে বসে দেখি, বাবা ঠিকই বলেছেন মা কালীও তো দেবীই বটে! ত্রিবেণীর সনৎ মজুমদার কোনো পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে 'অ্যারেস্ট' হয়েছিলেন। সনৎদা ও রিষড়ার রঞ্জিতদা এখন স্বর্গবাসী। সোশ্যালিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান (এসপি) ছিলেন বিমান মজুমদার। নকশাল কর্মী হিসেবে ধৃত হয়েছিলেন ঘাটালের মানিকদা, শেওড়াফুলির পরেশদা। আনন্দমার্গের ছিলেন শ্রীরামপুরের প্রভাতদা ও আরামবাগ স্কুলের এক আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব জেলেই সত্যাগ্রহীরা কম-বেশি ছিলেন। সত্যাগ্রহ করে যেসব স্বয়ংসেবক গ্রেপ্তার হয়ে হুগলী জেলে ছিলেন তাদের সংখ্যা ৯৮ হবে। আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থেকে জয়ন্ত সেন, স্বপন ঘোষ, মদন মুর্মু; মানিক হালদার ও নবকুমার ধাড়া (বালিবেলা), তপন মণ্ডল (ডিহিবায়রা), বিশ্বনাথ বেরা ও অশোক বেরা (পুড়শুড়া)। অন্যান্যদের মধ্যে যাদের নাম এখন মনে পড়ছে তারা হলেন সুধাময় দত্ত (প্রচারক, চুঁচুড়া), শিবাজী দত্ত ও আনন্দমোহন দাস (দ্বারহাট্টা), দেবাশিস লাহিড়ী, বিকাশ ঘোষ রায়, অশোক সিংহ (শ্রীরামপুর), পবিত্র রায়চৌধুরী, রণজিৎ সাহা (রিষড়া), বীরেন পাল, মৃন্ময়, অসীমকৃষ্ণ (হুগলী-চুঁচুড়া), গোপাল ঘোষ (মগরা), রামকৃষ্ণ লোহার (গোপালপুর), দুলাল ঘোষ (মাখাণ্ডি), চিত্ত মাইতি (ইটাচুনা), শম্ভু ধাড়া প্রমুখ। ভদ্রেশ্বর ও চাঁপদানীর পাঁচ-ছয়জন। আরও অনেকে ছিলেন, এই মুহূর্তে তাদের নাম মনে পড়ছে না।

আমাদের সত্যাগ্রহী স্বয়ংসেবকদের একটা দিনচর্যা ছিল— অনেকটা সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের মতো। সারা দিন তাই খুব আনন্দেই কাটতো। জেলের রক্ষীরা বলতেন, আপনারা জেলে এসেছেন না ট্রিপ করতে এসেছেন? পরে এই মর্মে স্বয়ংসেবকদের মধ্যে একটা কথা চালু হয়েছিল— আপনার 'জেটিসি' হয়েছে?

ঘটনা হলো, যারা জেলে ছিলেন, তারা তো সম্মানিত হলেন। কিন্তু যারা বাইরে থেকে সেসময় এই বিরাট কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করলেন, এমন বহু কার্যকর্তা রয়ে গেলেন নেপথ্যে।

বস্তুত এঁরাই ছিলেন সাফল্যের কাণ্ডারি। তাঁদের প্রতি রইলো সশ্রদ্ধ প্রণাম। সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সারির কার্যকর্তারা যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের কেউই আর ইহলোকে নেই। বস্তুত তাঁরাই 'মরণের মাঝে গেয়ে গেল জীবনের জয়গান'।

প্রতি চোদ্দ দিন অন্তর আমাদের আরামবাগ কোর্টে নিয়ে যাওয়া হতো। যখন একসঙ্গে যাওয়ার দিন পড়ত, তখন স্লোগান উঠত 'বন্দে মাতরম্', 'গণতন্ত্র বাঁচাও', 'জরুরি অবস্থা হটাও' কিংবা 'সঙ্ঘের থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করো, প্রত্যাহার করো'। সেদিন অনেক পরিচিত মুখকেই আশেপাশে দেখতে পেতাম। হাসির বিনিময় হতো। খিদে যে কী ভয়ঙ্কর তা একদিন কোর্ট লকআপে অভিজ্ঞতা হলো। সেদিন খুব সকালে যেতে হয়েছিল বলে জেল থেকে কেউই খেয়ে যেতে পারিনি। এদিন লক আপে মদন আঢ্য সুকুমার সরকার অন্যদিনের মতো কিছু খাবার নিয়ে এসেছিল। অন্যকে দিয়ে খাওয়াই রীতি। এটা আমরা সবাই করেও থাকি। সেদিন কিন্তু কাউকে না দিয়েই খেয়ে ফেললাম। পরে যখন বিষয়টা অনুভব করলাম, তখন নিজেই নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলাম না। খিধে যে কী ভীষণ বস্তু সেদিন তা বুঝেছিলাম। বাইরে থেকে যে খাবারদাবার আসতো তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল বিশুর (বিশ্বনাথ বেরা) উপর। একদিন একটু গুড় চাইলে আঙুলের ডগায় যতটুকু ওঠে ততটুকুই পড়ল। ভাঁড়ারের হাল যে কী শোচনীয়, তা বুঝলাম। বিশু শুধু সম্মান রক্ষার জন্যই দিয়েছিল।

জেল জীবনে থানা-পুলিশ-কোর্ট-উকিল তো বটেই, অভিযুক্ত বহু মানুষের সঙ্গে— তা রাজনৈতিক হোক বা ক্রিমিন্যাল, পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। কী করে পকেট মারতে হয় তার কৌশলও একজন দেখিয়েছে। মাসখানেকের মধ্যে আবার জেলে ফিরে আসতে দেখে একজনকে জিজ্ঞাস করাতে বলেছিল, ভেতরটাই ভালো। এক সদ্য জেলে আসা কয়েদিকে পুরানো কয়েদিরা মারছে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তর দিল— ব্যাটা 'রেপ কেস'-এর আসামি। বস্তুত তখনো আমি 'রেপ' শব্দটার মানে জানতাম না। সে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিল, 'এটা জানেন না'? এখন তো খবরের কাগজের পাতা খুললেই এই শব্দের ছড়াছড়ি। মাঝে মধ্যেই আমাদের সঙ্গে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুরা দেখা করতে আসতেন। পুলিশের প্রহরাতে জেলের গারদের ভেতর থেকে কথাবার্তা হতো। বাইরের খবরও কিছু জানা যেত, মানে বুঝে নিতে হতো। অন্যরা প্রথমে বিশ্বাস না করলেও পরে বলতেন, ঠিকই বলেছেন। সরকারের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষের উকিল যেভাবে সাহস দেখিয়েছিলেন, তার প্রশংসা করে তাঁকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। সেই চিঠিটা উনি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন জানিয়ে পরে তা দেখিয়েছিলেন।

ষোলো মাস পর (২১.০৭.১৯৭৫ —২১.১০.১৯৭৬) যখন ছাড়া পেলাম তখনও জরুরি অবস্থা--- সঙ্ঘ থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হয়নি। মধ্য কলকাতার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। নাম সব্যসাচী শীল। পরনে ফুলপ্যান্ট ও বুশ শার্ট। কেন্দ্র থেকে আসা বুলেটিন (ইংরেজি/হিন্দি) অনুবাদ ও সাইক্লোস্টাইলে কপি করে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেওয়া ছিল সেসময়ের অন্যতম কাজ। প্রথমে কিছুদিন একটা মেসবাড়িতে এবং পরে একজন স্বয়ংসেবকের বাড়িতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। ২১ মার্চ, ১৯৭৭-এর সন্ধ্যেবেলা প্রভাতদার (প্রভাকর লাখে) কাছে শুনলাম, সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এক অনাস্বাদিত আনন্দে মন ভরে গেল। □

মুর্শিদাবাদ জেলার নামকরণ করা হোক কর্ণসুবর্ণ

মুর্শিদাবাদ জেলার নাম 'কর্ণসুবর্ণ' করা হলে কোনো নবাবের ইতিহাস মুছে যাবে না, বরং বঙ্গের প্রথম স্বাধীন সাম্রাজ্যের গৌরবকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হবে। এটি হবে বাঙ্গালির নিজের শিকড়ে ফেরার এবং হারিয়ে যাওয়া আত্মসম্মানকে পুনরুদ্ধার করার এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

জীতেন্দ্র নাথ ঘোষ

শিকড়ে ফেরার আকুল আহ্বান : বহরমপুর থেকে তেরো কিলোমিটার দূরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে আজ এক নিস্তব্ধ ইতিহাস দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। যেখানে এককালে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল বঙ্গের প্রথম স্বাধীন অখণ্ড সাম্রাজ্যের গৌরবময় রাজধানী কর্ণসুবর্ণ, আজ তা এক প্রত্যন্ত গ্রামের অবহেলিত, উঁচু ফাঁকা মাঠ মাত্র। যে মাটির ধুলোয় মিশে আছে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের জ্ঞানচর্চা আর হিউয়েন সাঙের মুগ্ধতার বিবরণ, সেই রাজবাড়িডাঙ্গা আজ চরম অসহায়তায় যেন নীরবে বলছে, 'দেখো আমাকে, আমি কেমন নিঝুম দাঁড়িয়ে আছি! আমার অবস্থা তোমরা একবার চেয়ে দেখো।' অথচ নবাবি আমলের মাত্র তিনশো বছরের ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে এই প্রাচীন জনপদের নাম আজ মুর্শিদাবাদ। মধ্যযুগীয় এক সুবেদারের নামের চেয়ে, বঙ্গের আদি সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং হাজার বছরের প্রাচীন বাঙ্গালি সংস্কৃতিকে চিনতে এই কর্ণসুবর্ণ নামটি কি অনেক বেশি গৌরবময় নয়? ইতিহাসের এই নীরব কান্নাকে সম্মান জানাতে এবং বাঙ্গালির শিকড়ের আত্মপরিচয়কে পুনরুজ্জীবিত করতেই আজ বর্তমান রাজ্য সরকারের কাছে জোরালো আবেদন উঠছে, মুর্শিদাবাদ জেলার নাম পরিবর্তন করে কর্ণসুবর্ণ রাখা হোক।

স্মৃতির ধূলিকণায় রাজবাড়িডাঙ্গা— এক জীবন্ত হাহাকার : আজকের কর্ণসুবর্ণ এক চরম বৈপরীত্যের নাম। এক হাজার চারশো বছর আগে যে ভূমি ছিল সমগ্র গৌড় সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু, আজ তা এক ধূসর প্রান্তরে পরিণত হয়েছে। রাজবাড়িডাঙ্গার সেই উঁচু ফাঁকা মাঠটি এখন নিঝুম, শান্ত। সেখানে দাঁড়ালে মনে হয়, ফেলে আসা সোনালি দিনগুলোর কথা মনে করে বাতাসও সেখানে ভারী হয়ে উঠেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে বেরিয়ে আসা প্রাচীন ইটের পাঁজরগুলো আজ রোদে পুড়ছে, বৃষ্টিতে ভিজছে। তারা যেন পথচলতি মানুষকে ডেকে বলছে, 'আমরাই

ছিলাম বঙ্গের প্রথম স্বাধীনতার ভিত্তিপ্রস্তর, আজ কেন আমরা এত ব্রাত্য?' এই অবহেলা শুধু একটি স্থানের নয়, এটি আসলে আমাদের নিজেদের ইতিহাসের প্রতি আমাদের উদাসীনতার এক করুণ দৃষ্টান্ত।

মহাবীর শশাঙ্কের উত্থান এবং কর্ণসুবর্ণের গৌরবগাথা : ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায়, সপ্তম শতকের শুরুতে সমগ্র বাংলা যখন চরমতম রাজনৈতিক অব্যবস্থা, মাৎস্যন্যায় এবং বিচ্ছিন্নতায় ভুগছিল, তখন এক অসামান্য মহাবীরের আবির্ভাব ঘটে। তিনি মহাবীর শশাঙ্ক। তৎকালীন চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার অন্ধকারের বুক চিরে তিনি বঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে এক সুতোয় বেঁধে অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে প্রথম অখণ্ড ও স্বাধীন সার্বভৌম'গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাসবিদদের মতে বঙ্গের প্রথম স্বাধীন বাঙ্গালি নরপতি শশাঙ্ক ৫/৩ খ্রিস্টব্দের মধ্যে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আমৃতু রাজত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক নগেন্দ্রনাথ বসু উল্লেখ করেছেন, 'গঙ্গার পশ্চিম তীরে রাজধানী স্থাপন করে তিনি তাঁর পিতা কর্ণের নামানুসারে রাজধানীর নামকরণ করেছিলেন--- কর্ণসুবর্ণ।' বাঙ্গালির অস্মিতা, বীর্যবত্তার প্রতীক বঙ্গগৌরব, মহাবীর শশাঙ্ক কেবল বঙ্গের শাসক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট। তিনি পূর্বে উৎকল থেকে শুরু করে পশ্চিমে কনৌজ এবং উত্তরে কামরূপ পর্যন্ত নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এই অপরাজেয়, প্রজাবৎসল ও সুশাসক শশাঙ্ক সমগ্র ভারতবর্ষের বুকে বঙ্গ ও বাঙ্গালির প্রতি সমীহ আদায় করেছিলেন। তাঁর সুদক্ষ রণকৌশল আর দূরদর্শী কূটনীতির কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল উত্তর ভারতের বড় বড় শক্তিগুলো। তিনি সমগ্র ভারতের বুকে বাঙ্গালিকে এক বীরের জাতি হিসেবে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বাঙ্গালির জয়যাত্রার শক্ত ভিত : ঐতিহাসিক সত্য এই যে, রাজা শশাঙ্ক বঙ্গের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক যে শক্ত ভিত তৈরি করে দিয়েছিলেন, তার ওপর দাঁড়িয়েই পরবর্তীতে গৌরবময় পাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শশাঙ্কের দেখানো পথ ধরেই ধর্মপাল বা দেবপালের মতো শাসকেরা উত্তর ভারতে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, শশাঙ্কের তৈরি করা সেই অখণ্ডতার শক্ত ভিতেরই ধারাবাহিকতায় মুঘল শাসনে এই অঞ্চল হয়ে উঠেছিল ধনধান্যে সমৃদ্ধ 'সুবা বাঙ্গলা'। এমনকী ব্রিটিশ আমলেও এই বঙ্গের গুরুত্ব এতটাই অপরিসীম ছিল যে, দীর্ঘকাল এটি সমগ্র ভারতবর্ষের রাজধানী হিসেবে গৌরব অর্জন করেছিল। অর্থাৎ, আজকের আধুনিক ও শক্তিশালী ভারতের অর্থনীতির যে চালিকাশক্তি ছিল বঙ্গ, তার প্রথম বীজটি রোপণ করেছিলেন মহাবীর শশাঙ্ক তাঁর রাজধানী কর্ণসুবর্ণ থেকে।

মুর্শিদাবাদ নামের উৎস বনাম আত্মপরিচয়ের লড়াই : এর বহু পরে, অষ্টাদশ শতকের শুরুতে ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সাম্রাজ্যের দেওয়ান কারতলব খান তার প্রশাসনিক সদর দফতর ঢাকা থেকে স্থানান্তরিত করেন এবং মুঘল বাদশা আওরঙ্গজেবের দেওয়া মুর্শিদকুলি খাঁ উপাধির ওপর ভিত্তি করে এই অঞ্চলের নামকরণ করেন মুর্শিদাবাদ। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে এটি বঙ্গের নবাবের রাজধানী হয়ে ওঠে।

নিঃসন্দেহে নবাবি আমলের পলাশীর যুদ্ধের ট্র্যাজেডি এই মাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিন্তু বিচার করে দেখলে, মুর্শিদাবাদ নামটির বয়স মাত্র তিনশো বছরের কিছু বেশি। এটি একজন বহিরাগত সুবেদারের নবাবি অহং এবং মুঘল পরাধীনতার প্রতীক। একজন ব্যক্তির নামে একটি সমগ্র প্রাচীন জনপদের পরিচয় আটকে থাকা কি যুক্তিযুক্ত? বিশেষ করে যখন সেই মাটির বুকেই লুকিয়ে আছে হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন, সম্পূর্ণ দেশীয় এবং সার্বভৌম সংস্কৃতির নাম— কর্ণসুবর্ণ।

রাজ্য সরকারের কাছে বিনীত আবেদন : বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বদা বঙ্গের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং মানুষের অধিকারকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন। নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক গৌরব পুনরুদ্ধার করার নজিরও আমাদের রাজ্যে রয়েছে। তাই আজ আপামর ইতিহাসপ্রেমী ও সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে বিনীত আবেদন ও দাবি—

(১) বাঙ্গালির আদি বীরত্বের সম্মান : সম্রাট শশাঙ্ক ছিলেন প্রথম বাঙ্গালি সার্বভৌম শাসক, যিনি বাঙ্গালির অস্মিতা ও বীর্যবত্তার প্রতীক। মুর্শিদাবাদ জেলার নাম কর্ণসুবর্ণ করা হলে তা হবে আমাদের আদি বীর ও প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্রনায়কের প্রতি যথাযথ রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শন। **(২) ঐতিহাসিক ভারসাম্য রক্ষা :** মুর্শিদাবাদ নামটির মাধ্যমে জেলার হাজার বছরের প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের ঐতিহ্য ঢাকা পড়ে রয়েছে। কর্ণসুবর্ণ নামটির পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে এই অঞ্চলকে তার আদি ও আসল গৌরবে ফিরিয়ে আনা হোক। **(৩) ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ :** কর্ণসুবর্ণ নামটি জেলার কেন্দ্রবিন্দুর কাছে অবস্থিত এবং এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিশ্বজনীন শিক্ষার ইতিহাস। এই নাম পরিবর্তনের ফলে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের পর্যটন শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটবে এবং এলাকার অর্থনৈতিক ছবিটাই বদলে যাবে দীর্ঘশ্বাস থেকে গৌরবের আলোয়।

ইতিহাস কোনো স্থির চিত্র নয়; ইতিহাস এক চলমান স্রোত। সেই স্রোতে মকসুদাবাদ যেভাবে মুর্শিদাবাদ হয়েছিল, ঠিক একইভাবে আজ সময় এসেছে মুর্শিদাবাদকে তার আদি উৎস 'কর্ণসুবর্ণ'-এ ফিরিয়ে দেওয়ার। রাজবাড়িডাঙ্গার সেই উঁচু মাঠটি আর কতকাল অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে? তার সেই নীরব কিন্তু তীব্র আহ্বান রাজ্যবাসীকে শুনতে হবে। মুর্শিদাবাদ জেলার নাম 'কর্ণসুবর্ণ' করা হলে কোনো নবাবের ইতিহাস মুছে যাবে না, বরং বঙ্গের প্রথম স্বাধীন সাম্রাজ্যের গৌরবকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হবে। এটি হবে বাঙ্গালির নিজের শিকড়ে ফেরার এবং হারিয়ে যাওয়া আত্মসম্মানকে পুনরুদ্ধার করার এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান রাজ্য সরকারের কাছে বিনীত প্রার্থনা, রাজবাড়িডাঙ্গার সেই দীর্ঘশ্বাসকে এক নতুন ভোরের গৌরবে রূপান্তরিত করে, মুর্শিদাবাদ জেলার নামকরণ হোক— কর্ণসুবর্ণ। □

নবাঙ্কুর

রাখিবন্ধন

শ্রীকৃষ্ণের শ্রুতশ্রবা নামে এক পিসি ছিলেন। তাঁর গর্ভে শিশুপাল নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। জন্মগত ত্রুটির কারণে সদ্যোজাতের তিনটি চোখ এবং চারটি হাত ছিল। সেজন্য মা-বাবা তৎক্ষণাৎ তাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হলে দৈববাণী হয়, 'ওকে মেরে ফেলবে না। কখনো বিশেষ কেউ শিশুটিকে কোলে নিলে তার অতিরিক্ত অঙ্গগুলি লুপ্ত হয়ে যাবে।' সেই আশায় বুক বেঁধে বাবা-মা সন্তানটিকে লালন পালন করতে থাকে।

তারপর একদিন বালক শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিসির বাড়ি আসেন। তাঁকে দেখে তাঁর পিসি বললেন, ইস্, আমার ছেলে যদি তোমার মতো সুন্দর হতে পারত! শ্রীকৃষ্ণ ভাইকে দোলনা থেকে তুলে নিয়ে কোলে করে বসলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে শিশুপালের অতিরিক্ত চোখ ও দুটি হাত অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই দৃশ্য দেখে শ্রীকৃষ্ণ হেসে উঠলেন। কিন্তু তাঁর পিসি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, দৈববাণী হয়েছিল, যে কোলে নিলে শিশুপালের অতিরিক্ত অঙ্গ লুপ্ত হয়ে যাবে, তারই হাতে শিশুপালের মৃত্যু ঘটবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর পিসির কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন যে শিশুপালের একশো অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু তার বেশি নয়।

এদিকে শিশুপাল বড়ো হয়ে চেদি রাজ্যের রাজা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও দ্বারকার রাজা হয়েছেন। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। রাজসভায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেই যজ্ঞস্থলে সর্বশ্রেষ্ঠ পূজ্য হিসেবে অর্ঘ্য প্রদানের ব্যবস্থা চলছে, তখন শিশুপাল ক্ষিপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে তীব্র অপমান ও কটূক্তি করতে শুরু করল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী ১০০টি অপরাধ চুপচাপ সহ্য করে ক্ষমা করলেন। কিন্তু ১০১ তম অপরাধ করার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করে শিশুপালের মাথা কেটে ফেলেন। কিন্তু সুদর্শন চক্র নিক্ষেপের সময় শ্রীকৃষ্ণের আঙ্গুল কেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। হট্টগোলের জন্য সেটা কেউ খেয়াল করল না।

পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী মহারানি দ্রৌপদী তা লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে নিজের বহুমূল্য শাড়ির একটু অংশ ছিঁড়ে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের আঙ্গুলে বেঁধে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেল। দ্রৌপদীর এই কাজ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর স্পর্শ করল। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যখনই দ্রৌপদী কোনো সমস্যায় পড়বেন তখনই তিনি তাঁকে সহায়তা ও রক্ষা করবেন।

এর কয়েক বছর পর শকুনির কুটচালে পাণ্ডবেরা পাশাখেলায় কৌরবদের কাছে সর্বস্ব হেরে গিয়ে চরম অপমানের মুখোমুখি হলেন। দ্রৌপদীকে রাজসভায় ডেকে আনা হয়েছিল এবং দুষ্টু দুঃশাসন তাঁর নারীত্বের অপমান করার জন্য তাঁর শরীর থেকে শাড়ি খুলে নেওয়া চেষ্টা করছিল। তবে সে যতই চেষ্টা করুক না কেন দ্রৌপদীর শরীর থেকে শাড়ি খুলে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো অলক্ষ্যে থেকে শাড়ি জোগান দিয়ে দ্রৌপদীকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

আসলে দ্রৌপদী সেদিন শ্রীকৃষ্ণের আঙ্গুলে যে বস্ত্রখণ্ড বেঁধে দিয়েছিলেন সেটা ছিল রক্ষাবন্ধন। অর্থাৎ রাখিবন্ধন। তাই শ্রীকৃষ্ণ সেদিন তাঁর বোনের সম্মান রক্ষা করেছেন।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

মাউন্ট মণিপুর

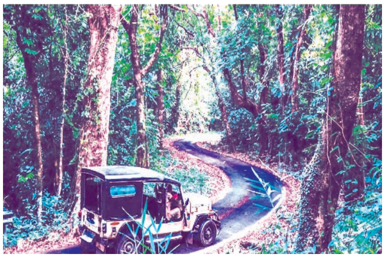

মাউন্ট মণিপুর ন্যাশনাল পার্ক আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পোর্ট ব্লেয়ারের কাছে একটি সুন্দর ও ঐতিহাসিক জাতীয় উদ্যান। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই উদ্যানটির নামকরণ হয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসক রবার্ট ক্রিস্টোফার টেইলরের স্ত্রী হ্যারিয়েট সি. টেইলরের নামানুসারে 'মাউন্ট হ্যারিয়েট ন্যাশনাল পার্ক'। বর্তমানে এর নাম পরিবর্তন করে মাউন্ট মণিপুর করা হয়েছে। এটি প্রায় ৪৬.৬২ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই উদ্যানে অবস্থিত পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট মণিপুর দক্ষিণ আন্দামানের সবচেয়ে উঁচু এবং পুরো দ্বীপপুঞ্জের তৃতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এখানকার ঘন ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্যে রয়েছে আন্দামানি বুনো শুয়োর, সামুদ্রিক কচ্ছপ, বড়ো কাঁকড়া এবং বিভিন্ন প্রজাতির প্রজাপতি ও পাখি। দর্শনার্থীদের জন্য প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

এসো সংস্কৃত শিখি-১২৫

सम्बोधनम् – इ-कारान्ते स्त्रीलिङ्गे
(भागः-२)

भगिनी – भगिनि! (বোন- ওহে বোন!)
सखी – सखि!
जननी – जननि!
देवी – देवि!
माधुरी – माधुरि!

जननि! अन्नं परिवेशयतु।
ও মা! ভাত বাড়ো।
देवि! प्रसीदतु।
नर्तकि! नृत्यतु।
पार्वति ! अत्र उपविशतु।
(এভাবে বাক্যরচনা করতে হবে।)

ভালো কথা

স্বাধীনতা দিবস

এবারে প্রধানমন্ত্রীর কথামতো আমাদের পাড়ায় কয়েক দিন আগে থেকেই সবার বাড়িতে বাড়িতে জাতীয় উত্তোলন করা হয়েছিল। স্বাধীনতা দিবসের সকালে আমরা সারা পাড়ায় স্বচ্ছতা অভিযান করেছি। অনেকগুলি গাছও লাগানো হয়েছে। আগেরদিন আমাদের রাজেনকাকু বলে দিয়েছিলেন কেউ যেন প্লাস্টিকের পতাকা না আনে। কাগজের তৈরি ছোটো ছোটো পতাকা দিয়ে রাস্তা সাজানো হয়েছিল। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর রেকর্ডিঙের সঙ্গে বন্দে মাতরম্ গাওয়া হয়েছে। আবার সন্ধ্যায় পতাকা অবতরণের সময় জনগণমন গাওয়া হয়েছে। আমার ঠাকুমা বলল, এবারের স্বাধীনতা দিবস পালনটা খুব ভালো হয়েছে।

অভিরূপ সরদার, অষ্টমশ্রেণী, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) প ন অ শা
(২) জি আ বা ত

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) দে দে প আ প বি
(২) বি তি ন্ন ন উ ধা

১০ আগস্ট সংখ্যার উত্তর
(১) চরিতকথা (২) কড়িবরগা

১০ আগস্ট সংখ্যার উত্তর
(১) মদনগোপাল (২) যোগসাধনা

(১) হৃতিকা মণ্ডল, জয়শ্রী, বাঁশদ্রোণী, কল- ৭০। (২) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (৩) কৃতিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, ইবি, মালদা। (৪) কুহেলী বিশ্বাস, কালীবাড়ি, বাঁশদ্রোণী, কল-৭০।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

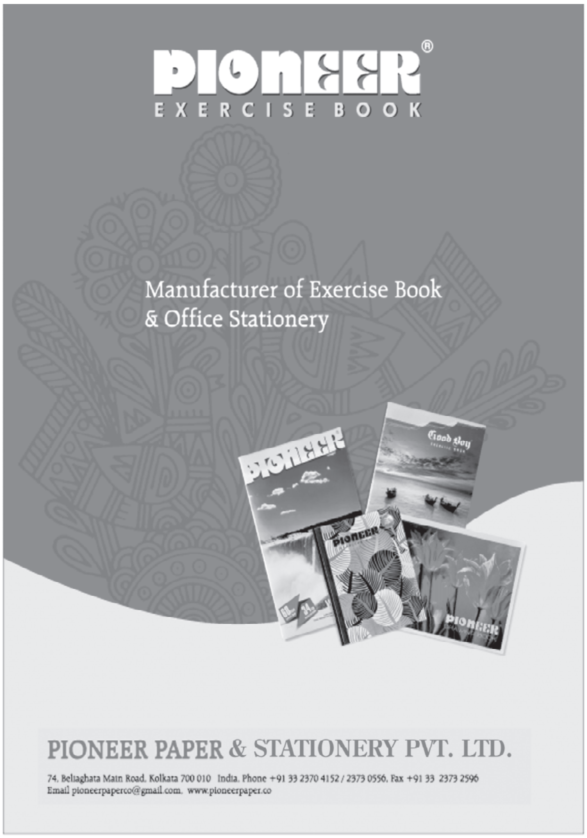

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

আরশোলার ব্যাকরণ ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য

তরুণের স্পন্দন ও প্রশাসনিক সংলাপ

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পেরিয়ে এসে একবিংশ শতকের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষ আজ এক অভূতপূর্ব জনমিতিক সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করছে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যুবশক্তির স্পন্দন এখন এই দেশের ধমনীতে। তরুণ প্রজন্মের এই বিপুল উপস্থিতি শাসনব্যবস্থার সম্মুখে একই সঙ্গে এক অনন্ত সম্ভাবনা এবং এক সুগভীর পরীক্ষা। এই নবীন প্রজন্মের মনস্তাত্ত্বিক ক্যানভাসটিকে বুঝতে পারলে তবেই চেনা যাবে আগামী ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভবিতব্য। সম্প্রতি মুম্বইয়ে দেশের এই নবীন প্রজন্মের প্রতিনিধি তথা জেন-জি এবং জেন-আলফাদের সঙ্গে এক মনোগ্রাহী বার্তালাপে অংশ নিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত। তাঁর মূল্যায়নে উঠে এসেছে এক চমকপ্রদ সত্য। তিনি এই প্রজন্মকে ভারতের 'সবচেয়ে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ' প্রজন্ম বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, এই প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের মনে দেশভক্তি ও পরার্থসেবার এক গভীর, সরল ও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। তারা আজ আর কোনো আপ্তবাক্য বা প্রাচীন প্রথাকে অন্ধভাবে মেনে নিতে রাজি নয়; তাদের প্রয়োজন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা এবং যুক্তিসঙ্গত উত্তর। আর এই উত্তরের অন্বেষণে তাদের প্রয়োজন অপরিসীম ভালোবাসা ও সহমর্মিতা।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই তরুণদের ক্ষোভ এবং তার প্রকাশকে সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক অত্যন্ত ভিন্ন এক মাত্রা দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, গণতন্ত্রে যখন নিয়মতান্ত্রিক সংলাপ বা দ্বিমুখী আলোচনা থমকে যায়, তখন রাজপথে আন্দোলন গড়ে তোলাও আসলে প্রতিবাদের বা ঐকমত্য গড়ে তোলার একটি বৈধ উপায় হয়ে উঠতে পারে। আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, এটিও এক প্রকারের কঠিন সংলাপ। তবে এই প্রতিবাদের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও ভাষা থাকা বাঞ্ছনীয়। সংলাপের ঐতিহ্যকে ভারতের প্রাচীন 'শাস্ত্রার্থ'-র সঙ্গে তুলনা করে সরসঙ্ঘচালকজী মনে করিয়ে দেন, সেখানে কোনো জয়-পরাজয়ের সস্তা অহংকার থাকে না। শাস্ত্রার্থে থাকে 'পূর্বপক্ষ' ও 'উত্তরপক্ষ', যার যৌথ মন্থনে উন্মোচিত হয় পরম সত্যের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। কিন্তু যখন এই গঠনমূলক প্রতিবাদের সরল আবেগকে অপব্যবহার করে এক সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করা হয় এবং যখন সেই আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক সাংবিধানিক পথ ছেড়ে নৈরাজ্যের পথে পা বাড়ায়, তখনই সমাজ ও দেশের অখণ্ডতা এক মহাসংকটের মুখে পড়ে।

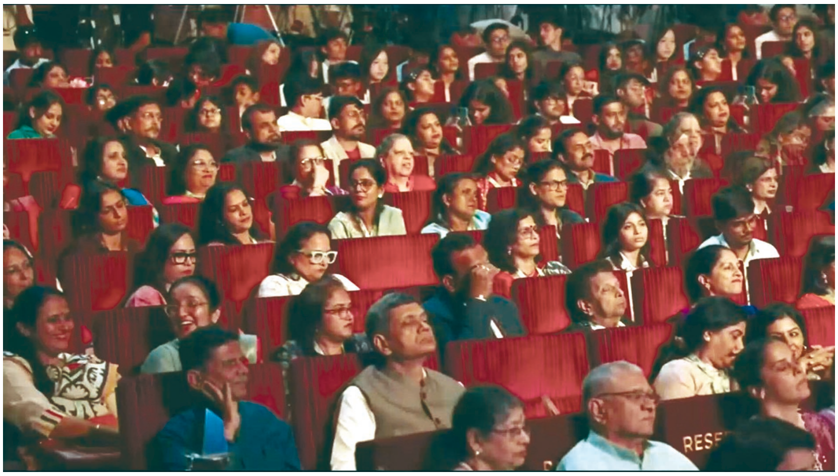

সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত সিজেপি— যা নেটমাধ্যমে 'ককরোচ জনতা পার্টি' নামে পরিচিত--- আন্দোলনটিকে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক পটভূমির একটি গুরুত্বপূর্ণ 'কেস স্টাডি' হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এটি কোনো আকস্মিক ছাত্র অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ছিল না, বরং তা ছিল সুপরিকল্পিত ও দীর্ঘমেয়াদি একটি প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। এই জটিল আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করতে হলে এর কালানুক্রম (ক্রোনোলজি), সুনির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি

(মেথডোলজি), প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন কাঠামো (সাপোর্ট সিস্টেম) এবং সর্বোপরি এর পেছনের আদর্শগত ভিত্তি বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

ক্লাউড ক্রাউড থেকে যন্তরমন্তর

আন্দোলনের ক্রোনোলজি বা কালানুক্রমের দিকে নজর দিলে এর কৃত্রিম গঠনের স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল কানাডায় বসবাসরত অভিজিৎ দিপকের হাত ধরে। সিজেপি যখন প্রথম ডিজিটাল মঞ্চে অবতীর্ণ হয়, তখন মাত্র দুই-তিন দিনের মধ্যে এটি অভূতপূর্ব সামাজিক প্রচার লাভ করে। এই প্রাথমিক ভার্চুয়াল সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে দিপকে ৬ জুন ভারতে আসেন এবং ৭ জুন থেকে সরাসরি প্রতিবাদের সূচনা করেন।

তবে অনলাইনের সেই বিপুল প্রচারের সঙ্গে ভারতের মাঠে- ঘাটের বাস্তবতার সাযুজ্য ছিল না। ৭ জুন থেকে ১৯ জুন পর্যন্ত দিপকে ভারতের বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে গণআন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও তা চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কোনো উল্লেখযোগ্য সাড়া না পেয়ে, ২০ জুন থেকে দিল্লির যন্তরমন্তরে একটি স্থায়ী অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। এই পর্যায় থেকেই আন্দোলনের সামগ্রিক রূপ, বৈভব ও অ্যাস্থেটিক্সে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

ছাত্রদের একটি স্বাভাবিক ক্ষোভের ওপর ভর করে কীভাবে এক বিশাল সাংগঠনিক জাল ছড়িয়ে দেওয়া হলো, তা বোঝা যায় এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া দীর্ঘ তালিকাটি পর্যালোচনা করলে। যুব ও ছাত্রদের আন্দোলন হওয়ার সুযোগ নিয়ে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন 'আইসা' এবং 'এসএফআই' মঞ্চের সামনের সারিতে চলে আসে এবং পুরো লজিস্টিকস নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। এর পরক্ষণেই যুক্ত হয় 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল', 'হিউম্যান রাইট্স্ ওয়াচ' এবং 'পিইউসিএল'-এর মতো আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের মানবাধিকার সংগঠনগুলি। এদের সঙ্গে হাত মেলায় অল ইন্ডিয়া ইউনিয়ন অব ফরেস্ট ওয়ার্কিং পিপ্‌ল্, বাপসা এবং অল ট্রাইবাল অসম স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের মতো উপজাতি সংগঠনগুলি। যোগ দেয় পিঞ্জরা তোড় কালেক্টিভ এবং ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান উইমেনের মতো উগ্র নারীবাদী সংগঠনগুলিও। স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন এবং মাইনরিটি অ্যান্ড বহুজন রাইট ফোরামের মতো ধর্মীয়- রাজনৈতিক মঞ্চের পাশাপাশি ইউনাইটেড খ্রিস্টান ফোরাম এবং অল ইন্ডিয়া ক্যাথলিক ইউনিয়নের মতো এলিট খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানগুলিও একই ছাতার তলায় জড়ো হয়। এডিটর্স গিল্ড অব ইন্ডিয়া এবং রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স-এর মতো প্রেস অ্যাসোসিয়েশন এবং সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা ও ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের মতো কৃষক সংগঠনগুলিও এই জোটে সরাসরি অংশ নেয়।

এই চরম বৈচিত্র্যময় ও স্বার্থসংঘাতপূর্ণ জোটকে একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে সুসংহত করার নেপথ্য মেথডোলজি-টি গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। যন্তরমন্তরের মঞ্চ থেকে ক্রমশ ছাত্র অধিকারের দাবি সরে গিয়ে স্থান পায় কট্টর সনাতন ধর্ম বিরোধিতা এবং দেশভাগের উসকানিমূলক স্লোগান। বামপন্থী চিন্তাবিদরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ ও মানসিক যন্ত্রণাকে হাতিয়ার করে আন্দোলনের নেতৃত্বকে নিজেদের কুক্ষিগত করে নেন, যা কার্যত একটি অরাজনৈতিক আন্দোলনকে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে খাড়া করে।

গ্রামশ্চির 'ওয়ার অব পজিশন', 'কালচারাল হেজিমনি' ও বিকল্প রাজনীতির রণকৌশল

চিন্তাবিদ অতুল লিময়ের সুচিন্তিত এবং দীর্ঘ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সিজেপি আন্দোলনটি নিছক কোনো আকস্মিক ছাত্র অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ছিল না। এর পিছনে কাজ করেছে এক অত্যন্ত জটিল 'ক্রোনোলজি' বা কালানুক্রম এবং সুনিপুণ 'মেথডোলজি' বা কার্যপদ্ধতি। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দার্শনিক তত্ত্বটি অনুসন্ধান করলে আমাদের ইতালীয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামশ্চির 'সাংস্কৃতিক আধিপত্য' তত্ত্বের মুখোমুখি হতে হয়। গ্রামশ্চি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর শুরুর এক মিলিট্যান্ট অ্যাক্টিভিস্ট ও বুদ্ধিজীবী, যাঁরা রাজনৈতিক দর্শন তৎকালীন ইতালির শাসক মুসোলিনিকে এতটাই ভীত করেছিল যে তাঁকে আজীবন কারাবাসে কাটাতে হয়। বিচারের সময় সরকারি কৌসুলি আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'এই মস্তিষ্কটিকে আগামী কুড়ি বছরের জন্য নিষ্ক্রিয় করে দিতে হবে।'

কারাগারের অন্ধকক্ষে বসেই গ্রামশ্চি বিশ্লেষণ করেছিলেন কেন প্রথাগত মার্কসীয় বিপ্লব ইউরোপের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ব্যর্থ হচ্ছিল। তিনি দেখালেন যে, শাসক শ্রেণী কেবল পুলিশ, সেনা বা আদালতের মতো আইন-প্রয়োগকারী প্রশাসনিকযন্ত্র (পলিটিক্যাল সোসাইটি) দিয়ে শাসন করে না, বরং তারা শাসন করে বিদ্যালয়, চার্চ, গণমাধ্যম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সুশীল সমাজের (সিভিল সোসাইটি) মাধ্যমে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা সমাজে এক ধরনের কালচারাল হেজিমনি বা সাংস্কৃতিক আধিপত্য তৈরি করে, যা শাসন শোষণকে সাধারণ মানুষের কাছে 'কমন সেন্স' বা প্রাকৃতিকভাবে স্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন করে। তাই শাসন ক্ষমতা দখলের জন্য সরাসরি সশস্ত্র বিপ্লব বা 'ওয়ার অফ ম্যানুভার' করার আগে একটি দীর্ঘমেয়াদি, ধৈর্যশীল মতাদর্শগত যুদ্ধ বা 'ওয়ার অব পজিশন' পরিচালনা করা প্রয়োজন, যা সমাজের এই প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত বুর্জোয়া সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে ভেতর থেকে চূর্ণ করবে।

সিজেপি-র আন্দোলনকারীরা ঠিক এই গ্রামশ্চিয়ান রণকৌশল অবলম্বন করেছিল, যার তাত্ত্বিক পরিভাষা হলো 'বিকল্প রাজনীতি'। এই দর্শনের মূল ভিত্তি হলো 'গণতান্ত্রিক উপায়ে গণতন্ত্রের পতন ঘটানো'। যেহেতু সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনে জয়ী হয়ে রাতারাতি শাসন ক্ষমতা অর্জন এদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই তারা গণতন্ত্র প্রদত্ত বাক্‌স্বাধীনতা ও প্রতিবাদের অধিকারকে হাতিয়ার করে শাসনযন্ত্রের স্তম্ভগুলিকে অকেজো করার কৌশল নেয়।

এই বিকল্প রাজনীতির অংশ হিসেবে তারা 'ডিকনস্ট্রাকশন থিওরি' প্রয়োগ করে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাণপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের মতো সাংস্কৃতিক আদর্শ চরিত্রগুলিকে নারী-বিরোধী বা দলিত-বিরোধী আখ্যা দিয়ে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে থাকা মানুষের বিশ্বাসকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়। আন্দোলনের সময় দিল্লির রাজপথে মোতায়েন থাকা পুলিশ বাহিনীর জবানবন্দিতে উঠে এসেছে চরম শঙ্কার ছবি। আন্দোলনকারী তরুণীদের উগ্র পোশাক, অশালীন অঙ্গভঙ্গি এবং কুশ্রাব্য স্লোগান সনাতন ভারতীয় মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়কে স্পষ্ট করে তোলে। পারিবারিক কাঠামো ভাঙার এই প্রক্রিয়ায় বামপন্থী আন্দোলনের প্রথম সারির নেত্রী নেহা বোরা গর্বের সঙ্গে প্রচার করেন যে, তাঁর বাবা একজন ভারতীয় সেনা আধিকারিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, কারণ তিনি বামপন্থী রাজনীতি করেন। এই ধরনের পারিবারিক ভাঙন ও পিতৃদ্রোহীকে 'বীরত্ব' হিসেবে মহিমান্বিত করা আসলে পরিবার ও ঐতিহ্যের সুরক্ষাবলয় থেকে যুবসমাজকে বিচ্ছিন্ন করার এক সচেতন কৌশল।

চিন্তাবিদ অতুল লিময়ের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই বিকল্প রাজনীতির নিখুঁত পাঁচ ধাপের একটি মডেল রয়েছে : ১. **কৌশলগত অনুপ্রবেশ** ঃ বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশাসনে সুপরিকল্পিতভাবে বামপন্থী মতাদর্শের লোকেদের অনুপ্রবিষ্ট করানো এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'ক্রিটিক্যাল থিওরি' ও কর্পোরেট সেক্টরে ডাইভারসিটি ইনডেক্সের মতো ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটানো। ২. **প্রতিষ্ঠানের মনোবল ভাঙা** ঃ নির্বাচন কমিশন, বিচারব্যবস্থা ও পুলিশের মতো প্রধান স্তম্ভগুলির প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করা। প্রশাসনের যেকোনো ছোটোখাটো ভুলকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরাট করে দেখিয়ে একটি সুপরিকল্পিত 'অ্যাসিমেট্রিক ন্যারেটিভ' তৈরি করা। ৩. **ন্যারেটিভের যুদ্ধ** ঃ সাহিত্য, সিনেমা, থিয়েটার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রীয় সংহতিকে আক্রমণ করে এক ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির বিস্তার ঘটানো। ৪. **সাংস্কৃতিক অবক্ষয়** ঃ লিভ-ইন সম্পর্কের মতো সামাজিক জীবনযাত্রাকে স্বাভাবিকীকরণ করে চিরাচরিত পারিবারিক বন্ধনকে দুর্বল করে দেওয়া। ৫. **রাস্তার আন্দোলন** ঃ চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে ক্রমাগত রাজপথের আন্দোলন ও অরাজকতা সৃষ্টি করে দেশকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করা।

> **'গ্রামশ্চির বিষাক্ত সাংস্কৃতিক মায়াজাল ছিন্ন করে গড়ে তুলতে হবে এক ইতিবাচক, গঠনমূলক ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক চেতনা। তরুণের গানের সুর যেন নৈরাজ্যের পথে না গিয়ে দেশ গঠনের পবিত্র যজ্ঞে মন্ত্রের মতো ধ্বনিত হয়— আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এটাই ভারতের অগ্রগতির একমাত্র চাবিকাঠি।'**

আম্বেদকরের 'অরাজকতার ব্যাকরণ' বনাম সিজেপি-র দ্বিচারিতা

এই সংকটের পটভূমিতেই আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরের ঐতিহাসিক দূরদর্শিতা ও সাবধানবাণী। ১৯৪৯ সালের ২৫ নভেম্বর, ভারতের গণপরিষদের শেষ ভাষণে বাবাসাহেব স্বাধীন ভারতের জন্য তিনটি সুগভীর সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে সাংবিধানিক ও আইনি পথ উন্মুক্ত রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাজপথে নেমে আইন অমান্য, অসহযোগ বা সত্যাগ্রহের মতো অসাংবিধানিক সহিংস প্রতিবাদের কোনো স্থান থাকতে পারে না। তিনি এই ধরনের অতিরিক্ত-সাংবিধানিক পথকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় 'অরাজকতার ব্যাকরণ' বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং সতর্ক করেছিলেন যে, এই ব্যাকরণকে যদি বর্জন করা না হয়, তবে আমাদের শ্রমলব্ধ গণতন্ত্রের প্রাসাদ ধূলিসাৎ হতে বাধ্য। তিনি বিশেষভাবে বামপন্থী এবং সমাজবাদী শক্তিগুলির অন্তর্নিহিত অসাংবিধানিক চরিত্র সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, যারা সংবিধানের ছায়াকে কেবল নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে এবং সুযোগ পেলেই সাংবিধানিক কাঠামোকে সমূলে উপড়ে ফেলতে চায়।

সিজেপি আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো বৈপরীত্য ও হিপোক্রেসি হলো, তারা দিল্লির যন্তরমন্তরের আন্দোলন স্থলকে ডঃ আম্বেদকরের ছবি দিয়ে সাজিয়েছিল এবং সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠের মাধ্যমে নিজেদের আইনি ও নৈতিক বৈধতা প্রমাণের এক নাটুকে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের কার্যক্ষেত্রে বাবাসাহেবের এই 'অরাজকতার ব্যাকরণ'-এরই এক উগ্র প্রয়োগ আমরা দেখতে পেয়েছি। সুপ্রিম কোর্টের মতো ভারতের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক আদালতের অন্তর্বর্তীকালীন রায় (Direction No. 4)-কে প্রকাশ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রত্যাখ্যান করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল এই আন্দোলনের নেতৃত্ব। তারা হুমকি দিয়েছিল যে, হিংসাত্মক দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে আইনি তদন্ত বন্ধ না হলে তারা পুনরায় রাজপথ অচল করবে। বামপন্থী বুদ্ধিজীবী যোগেন্দ্র যাদব যেমনটি বলেছিলেন যে, 'গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ এখন আর সংসদ ঠিক করবে না, প্রতিরোধ ঠিক করবে।' এটি কার্যত বাবাসাহেব আম্বেদকরের আজীবন সাধনার ফসল ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র ও সংবিধানের বিরুদ্ধে এক ঘৃণ্য যুদ্ধ ঘোষণা।

স্বতঃস্ফূর্ততার আড়ালে পেশাদার ছক

সিজেপি আন্দোলনের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই আন্দোলনের তথাকথিত 'স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র আন্দোলন'-এর মুখোশটি সম্পূর্ণ খসে পড়ে। দিল্লি পুলিশের সাম্প্রতিক তদন্ত এবং ডেটা বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে, এই আন্দোলনের নেপথ্যে সক্রিয় ছিল প্রায় ১৮০ জন অত্যন্ত প্রভাবশালী সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার এবং ৩টি

অত্যন্ত পেশাদার পিআর এজেন্সি (যার মধ্যে সম্প্রতি পুলিশ রেইড হওয়া 'Barcode Entertainment' অন্যতম)। ছাত্রদের দুঃখ ও ক্ষোভকে কৃত্রিমভাবে ভাইরাল করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ঢেলে এই ডিজিটাল প্রচার চালানো হয়েছিল। ইনস্টাগ্রাম প্ল্যাটফর্মটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল এক সুতীব্র মানসিক উত্তেজনা এবং আবেগ ছড়ানোর জন্য, যা পরবর্তীতে একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ট্যুইটার বা 'এক্স' (X) প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরিত করা হয়। তথ্য বলছে, ইনস্টাগ্রামে আন্দোলনের চরম রূপ দেখার ঠিক ১১ দিন পর ট্যুইটারে এই নিয়ে রাজনৈতিক ঝড় তোলা হয়, যা প্রমাণ করে আন্দোলনের পিছনে কাজ করেছে এক সুপরিকল্পিত এবং আন্তর্জাতিক স্তরের ডিজিটাল রণকৌশল।

কিন্তু এই আন্দোলনের সবচেয়ে কালো দিকটি হলো এর আভিজাত্য বনাম তৃণমূল স্তরের কর্মীদের চরম শোষণ ও বঞ্চনা। আন্দোলনের মূল মুখ সৌরভ দাসের আভিজাত্যপূর্ণ জীবনযাত্রার দিকে তাকালে চোখ কপালে ওঠে। দিল্লির গ্রেটার কৈলাস-১ এর মতো অতি-অভিজাত এলাকায় এক বিলাসবহুল ভাড়া বাড়িতে থাকেন তিনি, যার মাসিক ভাড়া কয়েক লক্ষ টাকা! অথচ তাঁর কোনো সুনির্দিষ্ট উপার্জনের উৎস নেই। আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অত্যন্ত ব্যয়বহুল পড়াশোনার কোটি কোটি টাকার উৎস নিয়েও সুগভীর অসঙ্গতি রয়েছে, যেখানে তাঁর অবসরপ্রাপ্ত বাবার মাসিক সরকারি পেনশন অত্যন্ত নগণ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা উসমান আলির মতো বহিরাগতদের থেকে প্রতি সপ্তাহে যন্তরমন্তরকে সচল রাখার জন্য লক্ষাধিক টাকার স্পন্সরশিপের প্রতিশ্রুতি এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স দ্বারা ধৃত উগ্রপন্থী হামিম মণ্ডলকে পুলিশ ইউনিফর্ম পরিয়ে দিল্লির আন্দোলনে নাশকতার কাজে পাঠানোর ষড়যন্ত্র এই আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সংযোগকে স্পষ্ট করে দেয়।

অথচ এই আন্দোলনের গ্রাউন্ড লেভেলের নিঃস্বার্থ কর্মীসমর্থকরা শিকার হয়েছেন চরম প্রতারণার। মহম্মদ জুনায়েদ নামের দিল্লির এক সাধারণ মোবাইল সারাইয়ের দোকানদারের কথায়, নিজের জীবনের সমস্ত সঞ্চয় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ করে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের জন্য দীর্ঘদিন ধরে খাবার ও জল সরবরাহ করছিলেন। কিন্তু যেদিন আন্দোলনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হলো এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করলেন, সেদিন সিজেপি-র এই এলিট নেতৃত্ব দিল্লির এক বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেলে মদ এবং উগ্র গানবাজনার মাধ্যমে সাকসেস পার্টিতে এতটাই মত্ত ছিল যে জুনায়েদ-এর একটি ফোন তোলারও অবকাশ মেলেনি। ঋণে জর্জরিত জুনায়েদকে শেষপর্যন্ত পুলিশের কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের মুখে সম্পূর্ণ একা ফেলে রেখে পালিয়েছিল এই তথাকথিত বিপ্লবী ছাত্র নেতারা। এর পাশাপাশি, এই 'শান্তিপূর্ণ' প্রতিবাদের হিংসায় ২০০ জনেরও বেশি পুলিশ কর্মী আহত হন এবং এক হেড কনস্টেবলকে পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করা হয়, যা সুপরিকল্পিতভাবে আন্দোলনের নিজস্ব ন্যারেটিভ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল।

পথরেখার সমীকরণ

এই নৈতিক ও সামাজিক দেউলিয়াপনার হাত থেকে দেশের যুবশক্তিকে রক্ষা করার পথ কী? সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত মুম্বইয়ের সংলাপে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও গঠনমূলক কিছু পথের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি আজকের জেন-জি প্রজন্মকে সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগোরিদমের অদৃশ্য ফাঁদ সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন। বর্তমান যুগের সোশ্যাল মিডিয়া মানুষের মনে চরম মেরুকরণ ও বিভেদ সৃষ্টি করছে। এটি এক কৃত্রিম 'ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশন' বা তাৎক্ষণিক প্রাপ্তির মোহ সৃষ্টি করে তরুণ প্রজন্মকে এক মারাত্মক বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সরসঙ্ঘচালক মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, বর্তমানের সোশ্যাল মিডিয়ার উগ্র 'রিল মডেল'দের অন্ধ অনুকরণ না করে, সমাজের উচিত সুস্থ ও গঠনমূলক 'রোল মডেল' তৈরি করা।

নেতৃত্বের প্রকৃত সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি এক অত্যন্ত প্রাচীন ও গভীর দর্শনের উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত নেতা তিনি নন যিনি সর্বদা প্রচারের আলোয় থাকতে চান। সরসঙ্ঘচালকের ভাষায়, 'True leaders are those who remain behind. They Work from within.' অর্থাৎ প্রকৃত নেতা সর্বদা অন্তরালে থেকে কাজ করেন এবং নিজের অহংকার ত্যাগ করে সংগঠনের সঙ্গে সকলকে বেঁধে রাখেন। একজন আদর্শ নেতার পাঁচটি চিরাচরিত গুণের উল্লেখ করেছেন তিনি— ত্যাগ করার ক্ষমতা (পাত্রে ত্যাগী), গুণের আদর করা (গুণে রাগী), অর্জিত সাফল্য ও সুখ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া (ভাগী পরিজনৈ সহ), সঠিক জ্ঞান অর্জন করা (শাস্ত্রে বোদ্ধা) এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোশহীন সংগ্রাম করা (রণে যোদ্ধা)।

শিক্ষা হোক বা পরিবেশ সংরক্ষণ, সব ক্ষেত্রেই সমাজকে ইতিবাচক পথে চালিত করতে হলে পরিবর্তন নিজের ঘর থেকে শুরু করতে হবে। সিজেপি-র মতো আন্দোলনগুলি তরুণ প্রজন্মের সৎ ও উগ্র আবেগকে ভুল পথে চালিত করে ভারতের সংবিধান ও সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করতে চায়। ডাঃ ভাগবতের প্রস্তাবিত সেই 'শাস্ত্রার্থ' বা গঠনমূলক সংলাপের মাধ্যমেই আমাদের এই সংকটের সমাধান করতে হবে। গ্রামশ্চির বিষাক্ত সাংস্কৃতিক মায়াজাল ছিন্ন করে গড়ে তুলতে হবে এক ইতিবাচক, গঠনমূলক ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক চেতনা। তরুণের গানের সুর যেন নৈরাজ্যের পথে না গিয়ে দেশ গঠনের পবিত্র যজ্ঞে মন্ত্রের মতো ধ্বনিত হয়— আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এটাই ভারতের অগ্রগতির একমাত্র চাবিকাঠি। □

শোকসংবাদ

মালদা জেলা সংস্কার ভারতীর লোককলা সংযোজক বাবলু মণ্ডলের বাবা অতুলচন্দ্র মণ্ডল গত ২ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে গণতন্ত্র রক্ষায় কারাবরণ করেছিলেন লোকতন্ত্র সেনানীরা

ডাঃ সনৎ বসু মল্লিক

১৯৭৫ থেকে ২০২৬ সাল, এই দীর্ঘ ৫১ বছর পশ্চিমবঙ্গের আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। দীর্ঘ ৩৪ বছর বামপন্থী অত্যাচারী শাসন আর দীর্ঘ ১৫ বছর মুসলমান তোষণের এক পারিবারিক শাসন মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। হিন্দু সমাজ অস্তিত্ব রক্ষার সংকটে ত্রাহি ত্রাহি রব ছেড়েছিল।

১৯৭৫ সালের ২৫ জুন রাত্রি ১২টায় বিধান সরণির ২৬ নম্বর বাড়িতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কার্যালয়ে ভারী বুটের শব্দে সিঁড়িটা কেঁপে উঠেছিল, দরজা ভেঙে ফেলার উপক্রম করেছিল পুলিশের দল। সেই সময় এই কার্যালয়ে ছিলেন সঙ্ঘের প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী, মেদিনীপুর জেলার স্বয়ংসেবক গৌরহরি দত্ত, বাঁকুড়া জেলার স্বয়ংসেবক ডাক্তার মানিক সেন, ঝাড়গ্রাম জেলার স্বয়ংসেবক হারাধন বেরা, দুর্গাপুরের স্বয়ংসেবক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও একজন স্বয়ংসেবক।

পুলিশ বাহিনী বন্দুকের নল বুকে ঠেকিয়ে বলে, 'আপনাদের এখনই আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় যেতে হবে।' স্বয়ংসেবকরা জানতে চাইলেন কারণটা কী। উত্তর, 'ওখানে গিয়েই জানবেন।' কয়েক মিনিটের মধ্যেই সকলকে জোর করে নীচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো এবং প্রিজন ভ্যানে তুলে থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। পরে জানতে পারা গেল, ওইদিন রাতেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনী জয় বাতিল করে দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী সেই রায় মানলেন না। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ-কে জোর করে দেশে অন্তর্বর্তী জরুরি অবস্থা জারি করতে বাধ্য করলেন।

সেই রাতেই একইভাবে সারাদেশে মোরারজি দেশাই, অটলবিহারী বাজপেয়ী, জয়প্রকাশ নারায়ণ, মধু দণ্ডবতে, জর্জ ফার্নান্ডেজ-সহ বিরোধী দলের প্রধান নেতাদের সকলকেই গ্রেপ্তার করা হলো। সঙ্গে আরও প্রায় ১০ হাজার সাধারণ কর্মীও গ্রেপ্তার হলেন। যদিও সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা তখনও হয়নি, কিন্তু সারাদেশের সব প্রদেশে প্রধান প্রধান কার্যালয়গুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ-প্রহরা বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারও প্রায় ১০ দিন পরে। ৪ জুলাই সঙ্ঘ এবং আরও কিছু সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হলো।

আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় সুনীলদা প্রমুখ কার্যকর্তাকে সারারাতব্যাপী বিভিন্ন ধরনের জেরা করা হতে থাকল এবং পরের দিন কোর্টে তাঁদের জামিনের বিরোধিতা করা হলো। সকলকেই লালবাজার পুলিশ কাস্টডিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। গৌরদা মাথাব্যথার চিকিৎসা করানোর জন্য কলকাতায় এসেছিলেন, মানিকদা আয়ুর্বেদিক ডাক্তারি পড়ছিলেন আর একজন স্বয়ংসেবক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি পড়ছিলেন এবং সুনীলদা আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। লালবাজারে ১৪ দিন কঠোর অত্যাচারের পরে তাঁদের সবাইকে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। দীর্ঘ ৪ মাস এই ৬ জন স্বয়ংসেবক জেলের চোর, গুন্ডা, খুনি,

ডাকাত, সকলের সঙ্গে কীভাবে যে কাটালেন, সে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। উল্লেখযোগ্য, সেই সময় একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বয়ংসেবক ওমপ্রকাশ ঝুনঝুনওয়ালাকেও বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে জরুরি অবস্থার ৪ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। সারা দেশ কারাগারে রূপান্তরিত হয়েছে। সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খবরের কাগজকে প্রেস সেন্সরশিপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। সরকারি খবর ছাড়া কোনো খবর ছাপানো যাবে না। এরকম পরিস্থিতিতে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক নানাজী দেশমুখের চেষ্টায় সব বিরোধী দলকে নিয়ে 'জনসংঘর্ষ সমিতি' তৈরি হলো। ঠিক হলো, সারাদেশে এই কালা কানুনের প্রতিবাদ করা হবে। অহিংস সত্যাগ্রহ করে দলে দলে আমরা সবাই গ্রেপ্তার বরণ করব। সঙ্ঘের ছোটো ছোটো স্বয়ংসেবক যাদের ১৪, ১৫, ১৬ বছর বয়স, তারাও জেলে চলে গেল। তার দু'মাসের মধ্যে সারাদেশে এক লক্ষ সত্তর হাজার সত্যাগ্রহী জেল ভর্তি করে দিলেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও এক হাজারের বেশি সত্যাগ্রহী জেলে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৯০ শতাংশই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক।

প্রেসিডেন্সি জেলেও চার মাস পরে দুশো জন স্বয়ংসেবক সত্যাগ্রহী পৌঁছে গেলেন। চার মাস জেলের মধ্যেই সঙ্ঘের 'জেল ট্রেনিং ক্যাম্প' চালু হয়ে গেল। কারণ জরুরি অবস্থায় সঙ্ঘের শাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু কারাগারের মধ্যেই আমরা নিয়মিত শাখা, সঙ্ঘের বিভিন্ন উৎসব ও কার্যক্রম করতে থাকলাম। জেলের মধ্যে সেই সময় নকশাল, কংগ্রেসি, বামপন্থীদের কিছু অংশ এবং আনন্দমার্গীরা অনেকেই ছিলেন। কিন্তু আমাদের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। ফলে আমাদের ব্যবহারের কারণে সমস্ত জেলের কয়েদিরা আমাদের অনুরক্ত হয়ে গেলেন।

আমাদের উকিল স্বয়ংসেবকরা কয়েদিকে বিভিন্ন সমস্যার পিটিশন লিখে দিতেন। ডাক্তার স্বয়ংসেবকরা এখানে নিয়মিত চিকিৎসালয় চালু করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান— সরস্বতী পূজা, জন্মাষ্টমী, দোলপূর্ণিমা ইত্যাদি পালিত হতো। বিখ্যাত সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত, গৌরকিশোর ঘোষ, রাজনৈতিক নেতা হরিপদ ভারতী, সুশীল ধাড়া, সাধন সরকার, জ্যোতির্ময় দত্ত, নরেশ গঙ্গোপাধ্যায়, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার সুজিত ধর— তাঁরা সকলেই আমাদের সঙ্গে এই জেলে ছিলেন। এই জেলে একসময় ঋষি অরবিন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ মহাপুরুষ ছিলেন।

আরও ৪ মাস বাদে বহু সত্যাগ্রহী জামিন পেয়ে মুক্ত হয়ে গেলেন। আমরা চোদ্দজন, যার মধ্যে অমলকুমার বসু, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বংশীলাল সোনিকে 'মিসা' আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই ১৪ জন ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর থেকে ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করার দিন পর্যন্ত একসঙ্গে থেকে সবাই জেল থেকে বেরিয়ে এলাম।

১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালের জরুরি অবস্থার সময় গণতন্ত্র, সাংবিধানিক অধিকার ও মানুষের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়ে যাঁরা কারাবরণ করেছিলেন, তাঁদের স্মরণ ও সম্মান জানাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ৯ আগস্ট, ২০২৬ অনুষ্ঠিত হলো পশ্চিমবঙ্গ 'লোকতন্ত্র সেনানী সম্মান' অনুষ্ঠান। ৯ আগস্ট, ২০২৬ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন, বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ, যেটা আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ওই দিন ৩২৫ জন লোকতন্ত্র সেনানীকে এই সম্মান প্রদান করা হয়।

এছাড়াও অনেকেই আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, সময়ের নিয়মে তাঁরা মর্ত্যলোক ছেড়ে চলে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সাহস, ত্যাগ ও সংগ্রামের ইতিহাস আজও আমাদের কাছে অমলিন। যাঁরা আজ স্বর্গগত, এই মর্ত্যভূমি থেকে তাঁদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। আর যাঁরা আজও আমাদের মধ্যে রয়েছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওই দিন যাদের সম্মানিত করেছে, সেই সমস্ত 'লোকতন্ত্র সেনানী'র প্রতিও জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম ও আন্তরিক শ্রদ্ধা। তাঁদের জীবনের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে সেই কঠিন দিনগুলিতে বহু মানুষ কারাবরণ করেছিলেন। অসীম কষ্ট ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হয়েছিল। তাঁদের অনেকেই নীরবে কর্তব্য পালন করেছেন কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ বা প্রতিদানের প্রত্যাশা ছাড়াই। বহু বছর পরে তাঁদের স্মরণ করা এবং সরকারি স্তরে মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে সম্মান জানানো নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই মুহূর্তে তাই ইতিহাসের পাতায় অনেক ঘটনা সময়ের সঙ্গে ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু ত্যাগ, সাহস ও আদর্শের ইতিহাস কখনোই মুছে যায় না। এই সম্মান সেই ইতিহাসকেই নতুন প্রজন্মের সামনে আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিল।

লোকতন্ত্র সেনানীকে প্রতিমাসে ১০ হাজার টাকা সম্মানদক্ষিণা ও ১ হাজার টাকা চিকিৎসা সহায়তা বাবদ দেওয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। সরকারি বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের ব্যবস্থাও করা হয়েছে, চিকিৎসা পরিষেবাও নিঃশুল্ক করাতে পারবেন। আমরা ইতিহাসে জানি, মরাঠা সাম্রাজ্যে গুরু রামদাস ও ছত্রপতি শিবাজীর কথা। রাজা তাঁর গুরুদেবকে সম্পূর্ণ রাজ্যই ভিক্ষাস্বরূপ দান করেছিলেন। গুরুদেব শিষ্য শিবাজী মহারাজকে বলেন, 'এখন তুমি রাজ্যের অছি মাত্র, সেই হিসেবে যোগ্যতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করবে।'

ইতিহাসের এই শিক্ষা ২০২৬ সালে আমরা লোকতন্ত্র সেনানী সম্মান অনুষ্ঠানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকেও দেখলাম। ধুতি পরিহিত সঙ্ঘের প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামীর কাছে গিয়ে সম্মান জানিয়ে সশ্রদ্ধভাবে তাঁকে প্রণাম করলেন। পশ্চিমবঙ্গেও বিধাতার আশীর্বাদে হিন্দু জনগণ মুসলমান তোষণের একনায়কতন্ত্রের শাসনকে পর্যদুস্ত করে গৈরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক)

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৯৪)

অনুশাসন-কর্তব্যবোধ-সময়ানুবর্তিতা

সঙ্ঘ বিকাশে কেন্দ্র-শক্তির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দেশভক্তির আধারে ব্যক্তির মধ্যে অনুশাসন, কর্তব্যবোধ, সময়ানুবর্তিতা হলো মূল মন্ত্র যা ডাক্তারজী সমগ্র জীবন জুড়ে নিজের দ্বারা পালনের অজস্র উদাহরণ সকলের জন্য তৈরি করেছেন। সাধারণ একটা চিঠি লেখায় কোনো কাটাকুটি তিনি পছন্দ করতেন না। কাটা হলে— নতুন কাগজ নিয়ে আবার লিখতেন। চিঠি সঠিক ভাঁজ করে খামে ভরা, ঠিক জায়গায় ঠিকানা লেখা এগুলির বিষয়ে তাঁর অদ্ভুত সূক্ষ্ম সতর্ক দৃষ্টি ছিল। স্বয়ংসেবকের গণবেশ ঢিলেঢালা হলে তিনি বলতেন— 'আপনাদের গণবেশ বড়ো নিরামিষ মনে হয়'। অনুশাসন, সময়ানুবর্তিতা ডাক্তারজীর সমগ্র সত্তা জুড়ে সদাই অবস্থান করত।

একবার কয়েকজন স্বয়ংসেবক-সহ নাগপুর থেকে বিশ মাইল দূরে আড়েগাঁওএ এক কার্যক্রম উপলক্ষ্যে তিনি গিয়েছিলেন। পরের দিন রবিবার প্রভাত শাখায় সঞ্চলন ছিল। ৫টার মধ্যে পৌঁছতে হবে। কার্যক্রম স্থানে কাজ শেষ হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। মূল রাস্তা থেকে গ্রাম অনেক ভেতরে। এই সময়ে নাগপুর ফিরে আসার কোনো বাস ছিল না। ডাক্তারজী সকলকে নিয়ে হাঁটা শুরু করলেন। কাদা, কাঁকরে পা ক্ষত বিক্ষত হচ্ছিল। তা হোক সকালের মধ্যে সঙ্ঘস্থানে পৌঁছোতে হবে। ভাগ্য কিছুটা প্রসন্ন ছিল, মূল রাস্তায় উঠে কয়েক মাইল হাঁটতে হঠাৎ অসময়ে একটি বাস এল। বাসে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। ড্রাইভার ডাক্তারজীকে চিনতেন। তিনি ডাক্তারজীকে কোনোমতে তার পাশে বসিয়ে নিলেন। বাকি স্বয়ংসেবকেরা পা'দানিতে ঝুলে ঝুলে রাত আড়াইটা নাগাদ নাগপুরে পৌঁছে গেল। সকালে প্রভাত শাখায় পৌঁছতে অসুবিধা হয়নি।

সেবার ওয়ার্ধা জেলার সঙ্ঘচালক আপ্পাজী জোশী স্থানীয় নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভোটের দিন একটি গাড়ি নাগপুরে থেকে পাঠাবার জন্য তিনি ডাক্তারজীকে অনুরোধ করেন, যা সকাল ৭টার মধ্যে ওয়ার্ধা পৌঁছানো আবশ্যক। সে সময় ডাক্তারজীর খুব জ্বর, শয্যাশায়ী, তবুও তিনি একজন স্বয়ংসেবককে গাড়ি ঠিক করতে যাবেন বলে টাঙা ডাকতে বললেন। সেই স্বয়ংসেবক বলল আপনার এ অবস্থায় যাবার কোনো প্রয়োজন নেই, আমিই পারবো, বলে গাড়ি ঠিক করতে ওয়ার্ধা থেকে আগত ব্যক্তিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। কয়েক জায়গায় চেষ্টা করে যখন গাড়ি ঠিক করতে পারল না তখন লজ্জায় ডাক্তারজীর কাছে না গিয়ে ওই ব্যক্তিকে দিয়ে গাড়ি না পাওয়ার খবর পাঠিয়ে নিজে কার্যালয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ডাক্তারজী খবর শুনে তখনই মাফলার ইত্যাদি জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেন। রাত ১টায় কেশবরাও ব্রহ্মের দরজায় কড়া নাড়লে তিনি দরজা খুলে তো বিস্মিত— এত রাতে এত কষ্ট করে! সবকিছু শুনে কেশবরাও ডাক্তারজীকে বললেন— 'আপনি চিন্তা করবেন না, আমি এখনই গাড়ি নিয়ে ওয়ার্ধা রওনা করছি।

সেখান থেকে ডাক্তারজী কার্যালয়ে এসে দরজায় শব্দ করতে সেই স্বয়ংসেবক উঠে দেখলেন প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে রাত তিনটের সময় ডাক্তারজী দাঁড়িয়ে। দেখে হতভম্ব, কোনোমতে নিজেকে সামলে বললেন— 'ডাক্তারজী আমিতো গাড়ি না পাওয়ার খবর আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি'। ডাক্তারজী তাকে বললেন— 'গাড়ি না পাওয়ার জন্য তোমার যাতে চিন্তা না হয়, শুধু এই কারণেই তোমাকে বলতে এলাম যে শ্রীব্রহ্ম যথাসময় গাড়ি নিয়ে যাত্রা করছেন'। সেখান থেকে ডাক্তারজী বাড়ি ফিরে ওয়ার্ধার জন্য পত্র লিখলেন এবং একদম ভোরে গাড়ি ওয়ার্ধা রওনা করিয়ে দিয়ে তবে বিছানায় শুলেন। এই কাহিনি শোনার পরে মনে যে অনুভূতি তৈরি হয় সেখানে 'অদ্ভুত' 'অবিশ্বাস্য' 'অকল্পনীয়' সব শব্দই যেন কেমন ফিকে মনে হয়। নিঃসন্দেহে এ এক দেবসদৃশ চরিত্র।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩৩

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

থাকছে

দেবী প্রসঙ্গ, উপন্যাস,
জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোটো গল্প
প্রবন্ধ

সত্বর আপনার কপি বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা